এপ্রিল ২০২০ ❑ চৈত্র ১৪২৬-বৈশাখ ১৪২৭

নবারুণ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

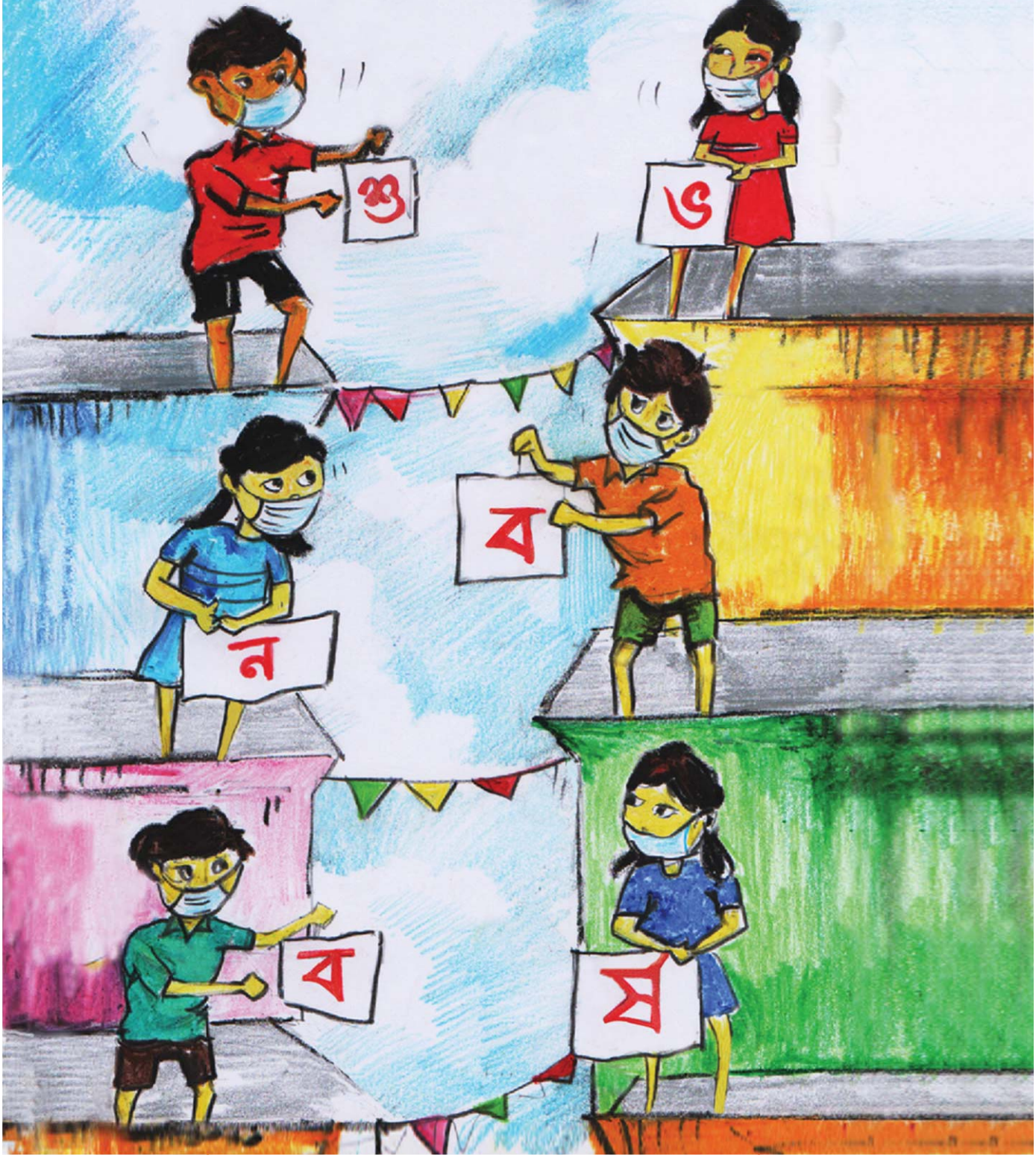

আহনাফ শাহরিয়ার নাহিন, ৫ম শ্রেণি, মুন্সী আজিম উদ্দিন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কিশোরগঞ্জ।

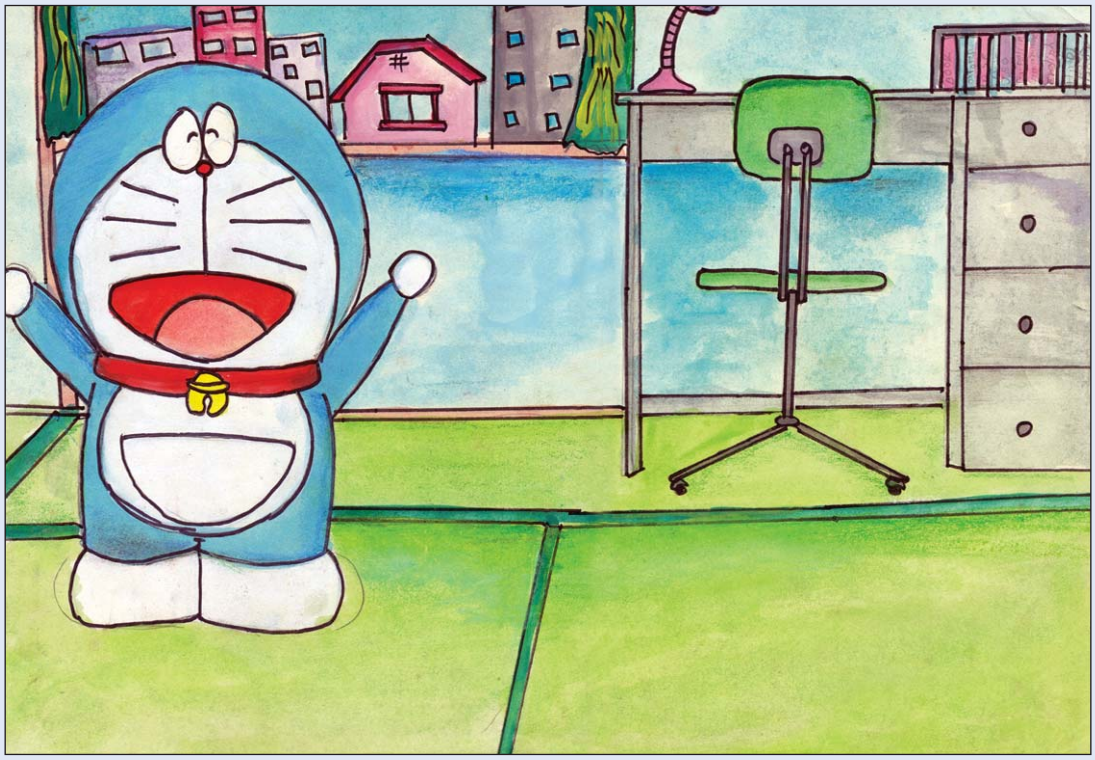

মো. সিনদিদ হোসেন, ১০ম শ্রেণি, আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা।

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

এপ্রিল ২০২০ ❑ চৈত্র-বৈশাখ ১৪২৭

প্রধান সম্পাদক
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

সিনিয়র সম্পাদক
মোহাম্মদ আলী সরকার

সম্পাদক
নুসরাত জাহান

সহ-সম্পাদক
শাহানা আফরোজ
মো. জামাল উদ্দিন
তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

সহযোগী শিল্পনির্দেশক
সুবর্ণা শীল

সম্পাদকীয় সহযোগী
মেজবাউল হক
সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

অলংকরণ
নাহ্‌রীন সুলতানা

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৬৮৮
E-mail : editornobarun@dfp.gov.bd
ওয়েবসাইট: www.dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৬৯৯

মূল্য: ২০.০০ টাকা।

মুদ্রণ : মিতু প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড প্যাকেজিং
১০/১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

সম্পাদকীয়

কেমন আছ বন্ধুরা? জানি তোমরা ভালো নেই। কোভিড-১৯ (করোনা) ভাইরাস নামক অদৃশ্য এক শক্তির হাতে জিম্মি আজ সারা বিশ্ব। এ সময় তোমাদের ভালো থাকার কথা নয়। তবুও তোমাদের জানাচ্ছি বাংলা নতুন বছর ১৪২৭ এর আন্তরিক শুভেচ্ছা।

গত বছরের ডিসেম্বরে সর্বপ্রথম চীনে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সন্ধান পাওয়া যায়। এরপর এটি ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এবং বাংলাদেশেও। পৃথিবীর অন্য সব দেশের মতোই আমাদের দেশেও করোনা ভাইরাস নিয়ে সাধারণ মানুষ খুবই আতঙ্কিত। সারা পৃথিবীর শিক্ষা ব্যবস্থাও একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে গেছে।

করোনা ভাইরাস মূলত সর্দি,কাশি এবং লালা জাতীয় পদার্থের মাধ্যমে একজনের শরীর থেকে অন্যজনের শরীরে সংক্রমিত হয়। সেই জন্য ছোট্ট বন্ধুরা তোমাদের বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশনা মোতাবেক চলতে হবে। সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে নিয়মিত ২০ সেকেন্ড করে দু'হাত ধুয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে। আর ঘরে থাকতে হবে। এ নিয়ে আতঙ্কিত না হয়ে সচেতন হবে, এই রোগকে প্রতিরোধ করবে। তবেই আমরা ধীরে ধীরে এ ক্ষুদ্র করোনা ভাইরাস থেকে মুক্ত হবো।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার 'মুজিবনগর সরকার' গঠিত হয় ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল। ১৭ই এপ্রিল সেই সরকারের মাননীয় সদস্যগণ শপথ নেন। আমরা সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি সেই মহতী ইতিহাসের বীর সেনাদের।

ভালো থেকো বন্ধুরা। তোমাদের জন্য শুভ কামনা। ■

সূচি

নিবন্ধ

০৪ বঙ্গাব্দ প্রবর্তনের ইতিবৃত্ত/আব্দুস সালাম
০৮ বোশেখ আমাদের চিরসবুজের নববর্ষ রহিম আব্দুর রহিম
১৪ মুজিবনগর দিবস ও মুজিবনগর সরকার মো. সিরাজুল ইসলাম
২১ মাস্ক পড়ি সুস্থ থাকি/মো. জামালউদ্দিন
৪১ শিশুর পছন্দ-অপছন্দকে প্রাধান্য দিতে হবে মাহমুদুর রহমান খাঁন
৫৫ হারিয়ে যাওয়া লোকজ ঐতিহ্য মেজবাউল হক
৫৭ বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা
৫৮ খুদে করোনা যোদ্ধা/জান্নাতে রোজী
৫৯ অসুস্থ পৃথিবীর সুস্থ শিশু/শাহানা আফরোজ
৬১ দশদিগন্ত/ সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি
৬২ বুদ্ধিতে ধার দাও/নাদিম মজিদ
৬৪ বুদ্ধিতে ধার দাও মার্চ ২০২০ -এর সমাধান

ছোটোদের গল্প

৫১ ওর নাম টাইগার/ওয়াহিদ মুস্তাফা
৫৩ বৈশাখি মেলার রহস্য/যাহিন যাওয়াদ

ভাষা দাদু

৩৮ চান্দ্রবর্ষ সৌরবর্ষ/তারিক মনজুর

কমিকস

৩৪ জীবাণু যুদ্ধ/কাজী তাবাসসুম আহমেদ

গল্প

১১ বৈশাখি মেলায়/নুরুল ইসলাম বাবুল
১৮ দীপুর বন্ধু করোনা/মোনোয়ার হোসেন
২৩ নারকেল গাছে কিচিক পাখি/শাম্মী তুলতুল
২৭ দিপু ও হরিণ/তারিকুল ইসলাম সুমন
৩০ দুষ্টু কাক ও মিষ্টি চড়ুই/ঝুমা আক্তার
৩৬ নীল ফড়িং ও টুনি/ইউনুস আহমেদ
৪৩ লাল গোম্বা নীল গোম্বা/ মুমতাহিনা জাহান
৪৭ ভূতের সাথে একরাত/আশরাফ আলী চারু

কবিতা

০৩ শাহ্ সোহাগ ফকির
০৭ নওদিনা ইসলাম/ কায়নাত মারিয়া
২০ তালবিয়া জিনাত
২২ আরিফা আক্তার
২৫ নাসির উদ্দিন/ নওমিনা ইসলাম
২৬ আলমগীর কবির/ আহমেদ রুমন
নূর ইসলাম/সাবরিনা আলম
২৯ মিহির হোসেন
৬০ ফারুক হোসেন

আঁকা ছবি

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ : আহনাফ শাহরিয়ার নাহিন/ মো. সিনদিদ হোসেন
১১ তাসফিয়া জামান তাসনিম
১২ মীর্জা মাহের আসেফ
৩২ শশী ইসলাম
৩৩ কাজী নাফিসা/ তারিনা সুলতানা রিপা
৫০ মোছা. জীম
৫২ মাহবুবা আক্তার তিশা
৫৪ সাকিব

নবারুণ পত্রিকার ফেসবুক পাতায় (Nobarun Potrika) আপলোডেড পত্রিকা পড়তে পারবে। এছাড়া চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট www.dfp.gov.bd-এর প্রকাশনা অংশ থেকে নবারুণ ডাউনলোড করা যাবে।

মোবাইলে নবারুণ পত্রিকা পড়তে চাইলে যে-কোনো স্মার্ট ফোনে গুগল প্লে স্টোরে গিয়ে Nobarun লিখলেই নবারুণ মোবাইল অ্যাপ আইকন আসবে। অ্যাপটি ডাউনলোড করে নিলেই প্রতিটি সংখ্যা পড়তে পারবে একদম সহজে।

নতুন আলো নতুন দিন

শাহ্ সোহাগ ফকির

নতুন সূর্যের নতুন আলো নতুন দিনের ডাক
মাঠ রাঙিয়ে ঘাট রাঙিয়ে এলরে বৈশাখ।
নতুন ফুলের নতুন কুঁড়ি ফুটছে ডালে ঐ
কি আনন্দ! কি আনন্দ! পড়েছে হৈ! হৈ! হৈ!
পান্তা ভাতে ইলিশ ভাজা সামলে না লোভ আর
মাটির বাসন ভরে দিলাম বাঙালির উপহার।
শহর-নগর, গ্রামে- গঞ্জে বৈশাখির ঐ মেলা
নাগরদোলা, বায়োস্কোপ আরো দেখছি সাপের খেলা।
আজ নতুনের প্রার্থনা করি ভুলে জীর্ণ - জরা
আলোয় আলোয় শোভিত করুক মঙ্গল দিয়ে ধরা।
সজিব প্রাণে মুক্ত হাওয়ায় নতুন আলোর দিন
পহেলা বৈশাখ সবার মনে বাজুক খুশির বীণ।

নিবন্ধ

বঙ্গাব্দ প্রবর্তনের ইতিবৃত্ত

আব্দুস সালাম

তোমরা অনেকেই জানো যে, প্রতিবছর ইংরেজি বর্ষের ১৪ই এপ্রিল বাংলা নববর্ষের প্রথমদিন অর্থাৎ পহেলা বৈশাখ উদযাপন করা হয়। তোমরা কি জানো এই বঙ্গাব্দ বা বাংলা সন আমাদের মাঝে কীভাবে প্রবর্তিত হয়েছে? হ্যাঁ, এখন তোমাদের সেই গল্পই বলব। সাথে সাথে তোমরা এও জেনে যাবে কীভাবে ইংরেজি সন হতে বাংলা সন বা বাংলা সন হতে ইংরেজি সনের দিন তারিখ বের করতে হয়। তার আগে সন, তারিখ, খ্রিষ্টাব্দ ও হিজরি সন বলতে কী বোঝায় সে বিষয়ে একটু ধারণা দেই।

'সন' ও 'তারিখ' দুটিই আরবি শব্দ। প্রথমটির অর্থ হলো 'বর্ষ' বা 'বর্ষপঞ্জি' এবং অন্যটির অর্থ 'দিন'। 'সাল' হচ্ছে একটি ফারসি শব্দ, যার অর্থ হলো বসর। খ্রিষ্টাব্দ হলো যিশু খ্রিষ্টের স্মরণে প্রবর্তিত একটি প্রতীকী অব্দ। সাধারণভাবে মেনে নেওয়া হয়েছে যে, খ্রিষ্টের জন্মগ্রহণের বছর থেকে এই অব্দের গণনা শুরু হয়েছে। হিজরি সন নবী করিম হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর হিজরতের স্মৃতিবহন করে আসছে। প্রিয় নবী (স.) ৬২২ খ্রিষ্টাব্দের ১২ই সেপ্টেম্বর মক্কা মুকাররামা থেকে মদিনার উদ্দেশে হিজরত করেন।

এবার আসি বঙ্গাব্দের বিষয়ে। তোমরা অনেকেই মুঘল সাম্রাজ্যের তৃতীয় সম্রাট আকবরের নাম শুনেছ। পুরো নাম জালালউদ্দিন মোহাম্মদ আকবর। মাত্র ১৩ বছর বয়সে তিনি ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেন। ১৫৫৬ সাল হতে ১৬০৫ সাল পর্যন্ত প্রায় ৫০ বছর শাসন করেছিলেন তিনি। তাঁর সময়ে তারিখ গণনার জন্য হিজরি, শকাব্দ, ইংরেজি, বিক্রমাসম্ভাত সন এবং

ভাস্করাব্দ মতো নানান সন চালু ছিল। সম্রাট আকবরের আমলে সুবা-এ-বাংলা (বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা) মোগল শাসনের আওতাভুক্ত হয়। তৎকালীন সময়ে প্রজাদের নিকট হতে ফসলের মাধ্যমে খাজনা আদায় করা হতো। হিজরি সন চাঁদের ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় কৃষিপণ্য উৎপাদনের মৌসুম নিয়ে ঝামেলা হতো।

আবার ভারতবর্ষের মতো বিশাল দেশে একই সময় সকল স্থানের কৃষকরা একই সময় ফসল কাটত না। এর ফলে কৃষকরা অসময়ে খাজনা পরিশোধ করতে বাধ্য হতো। এই সমস্যার বিষয়টা পরিষ্কার হওয়ার জন্য তোমাদেরকে জানতে হবে চান্দ্রবছর এবং সৌরবছর বলতে কী বোঝায়। হ্যাঁ, এবার সেটিই বলব। চন্দ্রের হিসাব অনুসারে ০১ বছর হয় ৩৫৪ বা ৩৫৫ দিনে আর সূর্যের হিসাব অনুসারে ০১ বছর হয় ৩৬৫ বা ৩৬৬ দিনে। সৌরবছর –এর তুলনায় চান্দ্রবছর প্রায় ১১ দিন কম। অর্থাৎ প্রতি তিন বছরে ০১ মাসের হের ফের হয়। অথচ ফসল উৎপাদন করতে হলে কৃষকদের সৌরবছরের উপর নির্ভর করতে হতো। এর ফলে রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে এক জটিল সমস্যা দেখা দেয়। বছরে একটি নির্দিষ্ট সময়ে খাজনা আদায়ের জন্য মুঘল সম্রাট আকবর সৌরভিত্তিক সন প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। যেন কৃষকদের ফসল উৎপাদন ও খাজনা প্রদানে কোনো রকম কষ্ট না হয়। সম্রাটের সভাসদের মধ্যে একজন প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদ ছিলেন তার নাম ছিল আমির ফতেউল্লাহ শিরাজী। ১৫৮৪ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট আকবর সৌরভিত্তিক সন প্রচলনের জন্য তাকেই দায়িত্ব অর্পণ করেন।

সম্রাট আকবর ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দে এবং ৯৬৩ হিজরিতে সিংহাসনে বসেন। সম্রাট আকবরের সিংহাসনে আরোহণের দিন তারিখ স্মরণীয় করে রাখার জন্য আমির ফতেউল্লাহ শিরাজী ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ৫ই নভেম্বরকে নতুন সন গণনার ভিত্তি হিসেবে ধরেন। নতুন বছর-গণনা পদ্ধতির নাম তারিখ-ই-ইলাহি বা ইলাহি সন বিবেচনায় রেখে এই নতুন সনের প্রবর্তন হয় বলে সেই সময় এটাকে 'ফসলি সন' বলা হতো। সুবে বাংলায় খাজনা আদায়ের স্বার্থে মুঘলরা ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ১১ই মার্চ থেকে ইলাহি সন বা 'ফসলি সন' চালু করেছিল। তারিখ-ই-ইলাহি' এর পূর্বে বাঙালিরা শকাব্দ অনুযায়ী তারিখ গণনা করত। ৯৬৩ হিজরির প্রথম মাস মহররম –এর সময়ে শকাব্দ সনের মাস ছিল বৈশাখ। হিজরি সনের সঙ্গে মিল করে 'তারিখ-ই-ইলাহি'র প্রথম মাস বৈশাখ ধরে গণনা করা হয়। অর্থাৎ ৯৬৩ হিজরির ১লা মহররম তারিখ ছিল ৯৬৩ বাংলা সনের ১লা বৈশাখ। হিজরি ৯৬৩ সনকে ইলাহি সনের প্রথম বছর ধরা হয়েছিল এবং এর পরবর্তী বছর থেকে সৌর বছর হিসেবে গণনা শুরু করেন। প্রাথমিক পর্যায়ে এটি 'ফসলি সন' নামে অভিহিত হতো। 'বাংলা'র জন্য উদ্ভাবিত বলে এটি পরবর্তী পর্যায়ে 'বাংলা সন' নামে প্রচলিত হয়। পরবর্তী সময়ে যদিও ১৫৮৪ সালের ১০ বা ১১ই মার্চ তারিখে 'তারিখ-এ-এলাহি' 'বঙ্গাব্দ' নামে প্রচলিত হয়েছিল তবে এটি কার্যকর হয় ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দ হতে। তোমরা মনে রাখবে শূন্য (০) থেকে বাংলা সন গণনা করা হয়নি। ৯৬৩ বছর বয়স নিয়েই বঙ্গাব্দের যাত্রা শুরু হয়। এর প্রথমাংশ অর্থাৎ ৯৬৩ বছর সম্পূর্ণরূপে হিজরি সনভিত্তিক তথা চন্দ্র সন। পরবর্তী অংশ অর্থাৎ ৯৬৩ থেকে অদ্যাবধি সৌরভিত্তিক। তোমাদের আরো একটা কথা বলে রাখি আর তা হলো- বাংলা সনে আমরা বর্তমানে দিন ও মাসের যে নামগুলো ব্যবহার করি সেগুলো শকাব্দ থেকেই গৃহীত। সপ্তাহের নামগুলো রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ ইত্যাদি গৃহীত হয়েছে গ্রহপুঞ্জ ও সূর্য থেকে। মাসের নামগুলো, যেমন বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ ইত্যাদি আমরা পেয়েছি নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে।

তোমরা অনেকেই জানো যে, পৃথিবীর সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৭ সেকেন্ড লাগে। এই ঘাটতি দূর করার জন্য প্রতি চার বছর পর পর ফেব্রুয়ারি মাসের সঙ্গে একদিন যোগ করা হয়। এটাকে লিপইয়ার বা অধিবর্ষ বলা হয়। ইংরেজি সন বা খ্রিষ্টাব্দে কোনো বছর অধিবর্ষ হবে কিনা তা মনে রাখার সহজ উপায় হলো সেই বছরটি যদি ৪ দ্বারা বিভাজ্য হয় তাহলে জানতে হবে বছরটি অধিবর্ষ হবে। তখন ফেব্রুয়ারি মাসের সাথে ০১দিন হয়ে তা ২৯ দিনে হবে। প্রতি ৪ বছরে ১ দিন যোগ করার ফলে ৪০০ বছরে প্রায় ৩টি অতিরিক্ত দিনের সৃষ্টি হয়। তাই ৪টির মধ্যে কেবলমাত্র একটি শতাব্দী বছর লিপইয়ার হিসেবে ধরা হয়। এ কারণে ১৭০০, ১৮০০ ও ১৯০০ সাল লিপইয়ার ছিল না এবং ২১০০ সালও লিপইয়ার হবে না। কিন্তু ১৬০০ এবং ২০০০ লিপইয়ার ছিল কারণ ওই বছরগুলো ৪০০ দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বিভাজিত।

তাহলে তোমাদের অনেকের মনে প্রশ্ন আসতে পারে খ্রিষ্টীয় সনের মতো বাংলা সনে শুরু থেকে লিপইয়ার বা অধিবর্ষের হিসাব করা হতো কিনা বা না হলে কবে থেকে হিসাব করা হয়েছে। হ্যাঁ, এবার সে বিষয়েই তোমাদেরকে জানাব। বঙ্গাব্দের যাত্রা শুরুর পর থেকে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত খ্রিষ্টীয় সনের মতো বাংলা সনে লিপইয়ার বা অধিবর্ষ ছিল না। ১৯৬৬ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি তারিখে বাংলা একাডেমির তত্ত্বাবধানে ভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর নেতৃত্বে একটি বঙ্গাব্দ সংস্কার কমিটি গঠিত হয়। উক্ত কমিটি চার বছর পরপর চৈত্র মাস ৩০ দিনের পরিবর্তে ৩১ দিনে গণনা করার পরামর্শ দেয়। বাংলা একাডেমি কর্তৃক সংশোধিত 'বাংলা সন ১৯৮৮ সালের ১৯শে জুন তারিখে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক 'বাংলা সন'-এর সংশোধিত রূপ হিসেবে স্বীকৃত হয় এবং তখন থেকে ১৪ই এপ্রিল পহেলা বৈশাখ পালন করা হয়।

১৪২৫ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত বৈশাখ থেকে ভাদ্র- এই পাঁচ মাস ৩১ দিনে গণনা করা হতো। আশ্বিন

থেকে চৈত্র- এই সাত মাস গণনা করা হতো ৩০ দিনে। লিপইয়ারে ফাল্গুন মাস গণনা করা হতো ৩১ দিনে। এ কারণে ২১শে ফেব্রুয়ারি বা ১৬ই ডিসেম্বরের মতো জাতীয় দিবসগুলোতে বাংলা ও ইংরেজি তারিখে পার্থক্য দেখা দেয়। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ছিল ৮ই ফাল্গুন, ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর ছিল ১লা পৌষ। কিন্তু ইংরেজি বছরের মিল রাখতে গিয়ে গত কয়েক দশক ধরে একুশে ফেব্রুয়ারি পালিত হয় ৯ই ফাল্গুন, বিজয় দিবস পালন করা হয় ২রা পৌষ। জাতীয় দিবসগুলো যেদিনে সংঘটিত হয়েছিল, সেই বাংলা তারিখ ঠিক রাখতে ২০১৫ সালে অধ্যাপক অজয় রায়কে প্রধান করে কমিটি গঠন করে বাংলা একাডেমি। কমিটির সুপারিশ মেনে বদলে গেছে বাংলা বর্ষপঞ্জি। ১৪২৬ সাল থেকে আশ্বিন মাস গণনা করা হচ্ছে ৩১ দিনে। অধিবর্ষ (লিপইয়ার) হলে ফাল্গুন মাস পূর্ণ হবে ৩০ দিনে। তবে অন্য বছরগুলো ফাল্গুন মাস গণনা করা হবে ২৯ দিনে।

এ প্রসঙ্গে তোমাদের একটা কথা বলে রাখি দিই। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ছিল ৮ই ফাল্গুন, কিন্তু ইংরেজি বছরের মিল রাখতে গিয়ে গতকয়েক দশক ধরে একুশে ফেব্রুয়ারি পালিত হয় ৯ই ফাল্গুন, ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ ছিল ১২ই চৈত্র। কিন্তু এতদিন ১৩ই চৈত্র স্বাধীনতা দিবস পালিত হতো। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর ছিল ১লা পৌষ। বিজয় দিবস পালন করা হত ২রা পৌষ। বর্ষপঞ্জি সংশোধনের ফলে এখন থেকে ৮ই ফাল্গুন শহিদ বিবস, ১২ই চৈত্র স্বাধীনতা দিবস এবং ১লা পৌষ পালিত হবে বিজয় দিবস। ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রজয়ন্তী ও ১১ই জ্যৈষ্ঠ নজরুল জয়ন্তী পালিত হবে যথাক্রমে ৮ই মে ও ২৫শে মে। আর পহেলা বৈশাখ হবে আগের মতো ১৪ই এপ্রিলে। ■

এল বৈশাখি মেলা

নওদিনা ইসলাম

এল বৈশাখ বসবে আবার
বৈশাখি মেলা
মেলায় গিয়ে কিনব পুতুল
করব পুতুল খেলা।
কিনব হাতি-ঘোড়া
কিনব মুড়ি-মুড়কি
মিঠাই কিনে খাব
কিনব হাওয়াই চরকি।

৫ম শ্রেণি, বিলচান্দক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, জেলা: পাবনা।

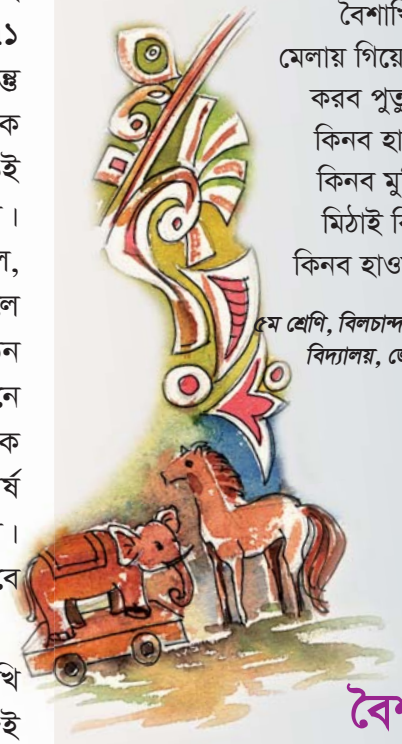

বৈশাখ

কায়নাত মারিয়া

বৈশাখ এলে মাঠে-ঘাটে
মেলায় বাউলেরা গায় গান
তাই শুনে বাঙালির
নাচে মন প্রাণ।
পান্তা ইলিশ প্রিয় খাবার
খায় যে সবাই মিলে
এক সাথে উপভোগ করে
যায় সব ভেদাভেদ ভুলে।

ষষ্ঠ শ্রেণি, মাগুরা উচ্চ বিদ্যালয়, নীলফামারী

নিবন্ধ

বোশেখ আমাদের চিরসবুজের নববর্ষ

রহিম আব্দুর রহিম

ষড়ঋতুর বাংলাদেশ। আমাদের ঋতু বৈচিত্র্যের পরিক্রমা মালায় গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত। এই ছয় ঋতুর বারোটি মাসের অপূর্ব বর্ষডালায় রয়েছে, বৈশাখ-জৈষ্ঠ্য, আষাঢ়-শ্রাবণ, ভাদ্র-আশ্বিন, কার্তিক-অগ্রহায়ণ, পৌষ-মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র। এই মাসগুলোর নামকরণ হয়েছিল, এক-একটি নক্ষত্রের নামে। পৃথিবীর সভ্যতায় মানব জাতি যখন জীবন জীবিকার তাগিদে গণনা করার জন্য সংখ্যা, অঙ্ক, একক পরিমাপের প্রয়োজন অনুভব করেন তখনই মানব সভ্যতায় আবির্ভূত হয় দিনপুঞ্জি, সন-তারিখ।

আর সেই আমল থেকেই মানুষের জীবন বৈচিত্র্যের নানা কল্পকাহিনির জেগে ওঠা ছবিই প্রকাশ পেয়েছে সাহিত্যমালায়। সাহিত্যের ছোঁয়ায় সময়ের পরিক্রমায় বাংলা সনের মূল কাঠামো গঠিত হয় হিজরি সনকে ভিত্তি করে। সময়ের চলমান গতিধারায় একটি করে নতুন দিনের উদয় হয় এবং একটি দিন হারিয়ে যায়। পৃথিবী তার মেরুরেখার ওপর একবার ঘুরপাক খেয়ে দিন-রাতের সৃষ্টি হয়। এই দিন-রাতের ছয় ঋতুর বারো মাসের ঘুর্ণায়নে 'নববর্ষের আবিষ্কার'।

সম্রাট আকবরের আমলে অর্থাৎ ১৫১৭ অব্দ থেকে নববর্ষের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়েছে। বাংলা নববর্ষকে কেন্দ্র করে সেই অনাদিকাল থেকে বাঙালির নানা আয়োজন। দোকানে দোকানে 'হালখাতা', গ্রাম, পাড়া-মহল্লায় জনমানুষের মিলনমেলা, কবি-সাহিত্যিকদের সাহিত্য রসের ব্যঞ্জনায় ভরে ওঠে প্রকৃতির আলো বাতাস। মনে-প্রাণে, ধ্যান-ধারণায় ভাবরসে জমে ওঠে পল্লিবালা। শুধু তাই নয়, নববর্ষের বোশেখে আমাদের যেমন আনন্দ এনে দেয়, তেমনি আবার প্রাকৃতিক দুর্যোগের দুঃসংবাদ আমাদের আতঙ্কিত করে। তাই তো কবি নজরুলের কবিতায় উঠে আসে,

'তোরা সব জয়ধ্বনি কর, তোরা সব জয়ধ্বনি কর,
ওই নতুনের কেতন ওড়ে কালবোশেখীর ঝড়,
তোরা সব জয়ধ্বনি কর।'

এই বৈশাখের প্রকৃতিও অপূর্ব ! দেখার মতো, অন্ধকার বিকেল, ঝড়ো বাতাস, দৈত্য সমান গাছের নূইয়ে পড়া, মগডালের মর্মর শব্দ, শুকনো পাতা ঝরার মৃদু ঝংকার, ভাবসাহিত্যে কতইনা মজার! নববর্ষের শুরুর কয়েকদিন আগে থেকেই গ্রাম শহরের বাড়িঘরে শুরু হয়ে যায় অলিখিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার। মা-ঝিয়েদের নাড়ু-মোয়া, ছানার মুড়কি তৈরির ঢেঁকিশালের কচকচানিতে মুখর হয়ে ওঠে সারাবাড়ি।

দোকানিদের বছর শেষের হিসাব মিলানোর আয়োজনে সুঁতলী সুঁতায় কলার পাতায় তৈরি গেট পেরিয়ে বাকি পরিশোধের আসরে হাজির হয় পাড়া-প্রতিবেশীরা। রাতের আধাঁরে হ্যাজাক বাতির আলোতে ওই আঙিনায় বসে জারি-সারি, পালা গান। খেঁটে খাওয়া মানুষের জীবন-জীবিকা, হাসি-কান্নায় পরিপূর্ণ এ সমস্ত পালাগান রাতভর উপভোগ করেন গ্রামের আবাল-বণিতা, নারী-পুরুষ, শিশু-কিশোররা।

শহর অঞ্চলে শুরু হয় যাত্রাপালা, বটতলায়, হাটখোলায় বসে বৈশাখি মেলা। এই মেলায় সার্কাস, পুতুল নাচ, জাদুখেলা, লাঠিখেলা, ঘোড়দৌড়, ষাড়ের লড়াই প্রভৃতি দেখা যায়। দোকানদারদের সাজানো পসরার কেনাবেচায় শিশুরা পায় মাটির পুতুল, কাঠের ঘোড়া, টিনের জাহাজ, মুড়ি-মুড়কি, খই-বাতাসা, কদমা, খাগরাই, জিলাপি, রসগোল্লা এবং এক পয়সার তালপাতার বাঁশি। গাঁয়ের বধূদের জন্য বিক্রি হয়, স্নো-পাউডার, আলতা-সাবান, শীতলপাটি। কিষাণ-কিষাণীদের জন্য মেলায় পাওয়া যায় পিড়া, লাঙল- জোয়াল, দাঁ-বটি, কাস্তে-কোদাল, বাঁশের কুলা-ডালা, খলই, পাখির খাঁচা, ঝুড়ি, মাদুর, চাটাই। পাওয়া যায় কৃষি ফল-ফসল, ডাব-তরমুজ, বাঙ্গি, খিরা, বেল।

নববর্ষের বোশেখ উপলক্ষ্যে ঘরে ঘরে খাবার দাবারের আয়োজন যেমন হয়, তেমনি একে অন্যের বাড়ি প্রাণের টানেই অলিখিত নিমন্ত্রণে যোগ দেয়। পাড়া-মহল্লায়, বাউলরা ঢোল-খোল,

সেতারা-সারিন্দা বাজিয়ে জমিয়ে তোলে সুরের ভূবন। শিশু-কিশোররা সারা বোশেখ জুড়েই অংশ নেয় ঘুড়ি খেলায়। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসিরা 'চৈত্র সংক্রান্তি' এবং বাংলা নববর্ষ উপলক্ষ্যে 'বৈসাবি' মারমা আদিবাসিরা 'সাংগ্রাই' এবং চাকমা ও তঞ্চঙ্গা আদিবাসিরা 'বিজু' উৎসব পালন করে। শুধু যে আমাদের দেশেই বর্ষবরণ বা নববর্ষ পালন হয় তা কিন্তু নয়। গবেষকদের মতে প্রায় চার হাজার বছর আগে ব্যাবিলনে নববর্ষ তথা বর্ষবরণ উৎসবের সূচনা হয়েছিল। ওই সময় বছর শুরুর ঋতু ছিল বসন্তকাল।

নৃ-তত্ত্ববিদদের মতে, যে- কোনো জাতি, গোষ্ঠী, সমাজ, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সভ্যতা ও সংস্কৃতির জন্য নববর্ষ এক গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। বাংলাদেশের বাঙালিদের মতোই পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মানুষেরা তাদের সংস্কৃতির সাথে মিল রেখে নববর্ষ পালন করে আসছে। এর মধ্যে ভারতে কালিপূজা উপলক্ষ্যে 'দীপাবলি', মায়ানমারে একক দেবীর উপাসনা করে জুলাই মাসে নববর্ষ উদযাপন হয়, কোরিয়ায় চন্দ্রমাসে 'সোল-নাল' অর্থাৎ নববর্ষ, ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা জানুয়ারি মাসের প্রথম দিন আতশবাজির মধ্য দিয়ে নববর্ষ পালন করে। জুলিয়ান ক্যালেন্ডার অনুযায়ী সুইজারল্যান্ড জানুয়ারি মাসের ১ তারিখ, অর্থাৎ ৩১শে ডিসেম্বর রাত ১২টা থেকে তাদের নববর্ষের আনুষ্ঠানিকতা শুরু করে। ভিয়েতনাম একই আদলে নববর্ষ পালন করে থাকে। তাদের বিশ্বাস ঈশ্বর ঘরে ঘরে বাস করেন। নববর্ষের দিন ঈশ্বর স্বর্গে চলে যান এবং সেখান থেকে মর্ত্যের লোকেরা কি করছেন তা খতিয়ে দেখেন। এই ঈশ্বর স্বর্গে যায় কার্প মাছের পিঠে চড়ে। তাই নববর্ষের দিনে কার্প মাছ নদীতে ও পুকুরে আনুষ্ঠানিকভাবে ছেড়ে দিয়ে নববর্ষ উদযাপন করে থাকে। ইরানে 'নওরোজ' নামে নববর্ষ পালিত হয়। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ইরানে ২১শে মার্চ আনন্দ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে নববর্ষ পালন করে থাকে।

এছাড়াও সুইজারল্যান্ড, রাশিয়া, চীন, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, ম্যাক্সিকো ও জাপানসহ পৃথিবীর অনেক দেশেই তাদের আচার আচরণের সাথে মিল রেখে নববর্ষ পালন করে আসছে। তবে বাংলাদেশের বাঙালিদের নববর্ষের বোশেখ আসে কুসংস্কার, অন্ধত্ব, হিংসা-বিদ্বেষ পিছনে ফেলে নতুনত্বের অবগাহনে সত্য, সুন্দর এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনার বারতা নিয়ে, নববর্ষের বোশেখ আসে আমাদের চিরসবুজের নববর্ষের জয়গান গেয়ে। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় উঠে আসে

'তোমার অবলোকনের আবরণখোলা হে মানব
আপন উদার রুপে প্রকাশ কর।' ■

বৈশাখি মেলায়

নুরুল ইসলাম বাবুল

ছোটো মামা আমাকে কাছে ডেকে বললেন, রনি, চলো মেলায় যাই। আজ বিকেলে কাশিনাথপুর বটতলায় মেলা বসবে। বৈশাখি মেলা। আমি কখনো মেলায় যাইনি। ছোটো মামার কথায় মনটা আনন্দে নেচে উঠল। মায়ের কাছে বায়না ধরলাম–মা,আমি মেলায় যাবো। আমার মামাত-খালাত ভাইবোনরাও যাবে। তাই মা রাজি হলেন। তখন দুপুরবেলা। মা সবাইকে ডেকে গোসল করতে বললেন। আমরা পুকুর ঘাটে হইচই করে গোসল করলাম। পয়লা বৈশাখ উপলক্ষ্যে বাবা সুন্দর একটা ফতুয়া কিনে দিয়েছেন। মা সেটা পরিয়ে দিলেন। আমার মামাত-খালাত ভাইবোনরাও জামা-কাপড় পড়ল। কিন্তু দুপুরটা যেন ফুরাতেই চাচ্ছে না। কখন যে বিকেল হবে আর আমরা ছোটো মামার সাথে বৈশাখি মেলায় যাব। ছোটো মামা খুব মজার মানুষ। নববর্ষ উপলক্ষ্যে তিনি নিজে গিয়ে আমাদের নিয়ে এসেছেন। অন্য খালাদেরও এনেছেন। আমার মামাত-খালাত ভাইবোন সবাইকে নিয়ে হাসি-তামাশায় মেতে থাকেন ছোটো মামা। আমাকে তিনি সবার চেয়ে বেশি ভালোবাসেন।

তাসফিয়া জামান তাসনিম, চতুর্থ শ্রেণি,
পাবুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কাপাসিয়া, গাজীপুর

বিকেলে আমাদের সবাইকে নিয়ে ছোটো মামা মেলায় রওনা হলেন। বাড়ি থেকে বের হওয়ার আগে বড়ো মামা, মেজ মামা, সেজ মামা, মেজ খালা, ছোটো খালা সবাই কিছু কিছু করে টাকা দিলেন। নানা-নানিও দিলেন। মায়ের কাছ থেকেও পেলাম। আর ছোটো মামা তো সাথেই যাচ্ছেন। আমাদের মনটা খুশিতে টইটুম্বর।

মামাবাড়ি থেকে উত্তর দিকে কাশিনাথপুর বটতলা। মাঝখানে একটা ফাঁকা মাঠ। অল্প একটু রাস্তা। আমরা দলবেঁধে হাঁটতে লাগলাম। ছোটো মামা আগে থাকেন, কখনো পেছনে পড়েন। কিন্তু আমার হাত ছাড়েন না। কিছু দূর যেতেই প্যাঁ-পুঁ বাঁশির আওয়াজ শুনলাম। শোনা গেল ঢোলের শব্দ। আর একটু যেতেই দেখা গেল চাকার মতো উঁচু কী যেন ঘুরছে। সেখান থেকে শোনা যাচ্ছে ক্যাঁচর-ক্যাঁচর শব্দ। মামা হাত দিয়ে সেটা দেখিয়ে বললেন, ওই দেখ, নাগরদোলা।

মেলার মধ্যে ঢোকার আগে ছোটো মামা সবাইকে সাবধান করে দিলেন। দলছুট হওয়া চলবে না। দলছুট হলেই হারিয়ে যাবে। তখন আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। আমি এই প্রথম মেলায় এলাম। আনন্দ লাগছে। ভয়ও করছে। মেলায় ঢুকতেই চোখে পড়ল নানা রকমের দোকান। মুড়ি-মুড়কি। খেলনা। বেলুন। মাটির তৈরি বাসন-কোসন। বাঁশ-বেতের তৈরি ঝুড়ি। আরো কত কী! ভীড় ঠেলে ছোটো মামা নিয়ে গেলেন নাগরদোলার

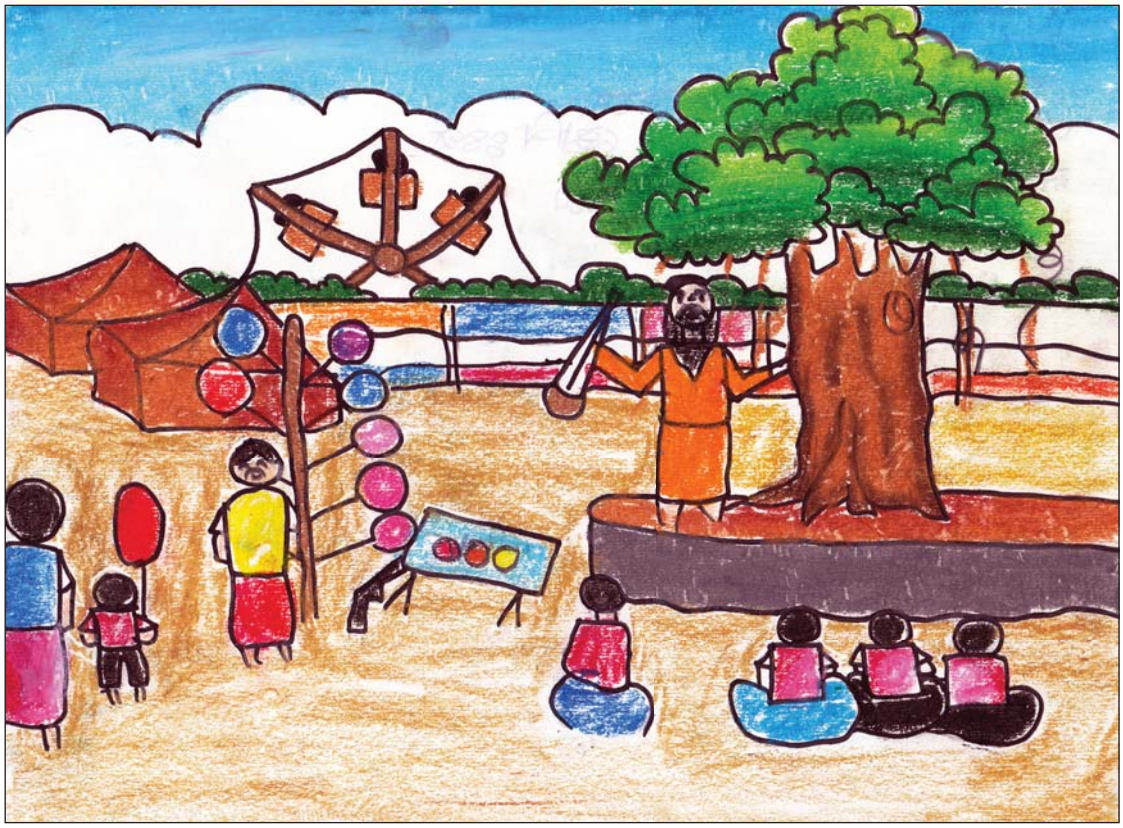

মীর্জা মাহের আসেফ, চতুর্থ শেণি, ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল, ঢাকা

কাছে। মামার সাথে নাগরদোলায় উঠলাম। মামা সবাইকে বসিয়ে দিয়ে আমাকে কাছে বসালেন। এক হাত দিয়ে পেঁচিয়ে ধরলেন। এই আমার প্রথম নাগরদোলায় ওঠা। ক্যাঁচর-ক্যাঁচর শব্দে নাগরদোলা চলতে শুরু করল। যখন উপরের দিকে উঠতে লাগল মনে হলো আকাশের দেশে যাচ্ছি। কী মজা! কী মজা! আনন্দে হাততালি দিলাম। দলের অন্যরাও হাততালি দিল। হঠাৎ দোলনা নীচের দিকে নামতে শুরু করল। সাথে সাথে বুকটা ধক করে উঠল। একটু পরেই আবার আকাশের দিকে উঠতে লাগলাম। দারুণ মজা হলো।

নাগরদোলা থেকে নামার পর ছোটো মামা নিয়ে গেলেন মিষ্টির দোকানে। একটা বিশাল বটগাছের নীচে দোকানটা। বিরাট ছাউনি টাঙানো। চারপাশে বেঞ্চ পাতা আর মাঝখানে নানারকম মিষ্টি সাজিয়ে বসে আছে দোকানদার। ছোটো মামাকে দেখে দোকানদার হেসে ফেললেন। হয়ত আগে থেকেই পরিচয় আছে। দোকানদার হাসতে হাসতে বললেন, কী হে আকন্দের ব্যাটা, এত পোলাপান কই পাইলা? শুনে মামা হাসলেন। দোকানদার আমাদের আদর করে বসতে দিলেন। সবার হাতে মিষ্টি পৌঁছে গেল। আমাদের সাথে গিয়েছিল রবিন। মামাদের বাড়ির পাশে ওদের ছোট্ট কুঁড়েঘর। ওর মা-বাবা গরিব মানুষ। নাগরদোলায় রবিন আমার সাথেই ছিল। আমার পাশে বসেই মিষ্টি খাচ্ছে। বৈশাখি মেলার মিষ্টি খেতে খেতে বাড়ির কথা ভুলে গেলাম।

খাওয়া শেষে মামা বললেন, তোমরা কে কী কিনবে? বড়ো মামার ছেলে মাহি একটা বিরাট মাটির ঘোড়া কিনল। মেজ মামার মেয়ে মলি কিনল দুইটা টেপা পুতুল। মাটি দিয়ে টিপে টিপে এই পুতুল বানানো হয়। অন্যরাও পছন্দ মতো এটা-সেটা কিনল। আমি কিনলাম টমটম গাড়ি। সেই সাথে সবার হাতে হাতে নানা রঙের বেলুন। আমি কিনেছি দুইটা বেলুন। রবিনকেও একটা খেলনা কিনে দিলাম। রবিন খুব খুশি হলো। ওর আনন্দ দেখে আমার ভালো লাগল।

ছোটো মামা বললেন, সন্ধ্যা হওয়ার আগেই বাড়ি ফিরতে হবে। সেই মেঠোপথ ধরে আমরা হৈ-হুল্লোড় করতে করতে রওনা হলাম। রাস্তায় পা রেখেই টমটম গাড়ি টানতে শুরু করলাম। চমৎকার টুংটাং আওয়াজ। কেউ বাঁশি বাজাচ্ছে প্যাঁ-পুঁ। দুষ্টু মাহি পা দিয়ে একগাদা ধুলি উড়িয়ে দিল। মামা ধমক দিলেন। পশ্চিমে থালার মতো লাল সূর্য। আমাদের হাতে হাতে রঙিন বেলুন। কী অপরুপ পড়ন্ত বিকেল!

বৈশাখি মেলা দেখে বাড়ি ফিরছি। সবার মনে আনন্দ। সবার মুখে হাসি। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল জাহান। সেজ মামার ছেলে জাহানের বেলুন ফেটে গেছে। অন্যরা হাততালি দিল। ভ্যাঁ-ভ্যাঁ করে কাঁদতে লাগল জাহান। ওর কান্না দেখে আমার একটা বেলুন ওকে দিয়ে দিলাম। জাহান খুব খুশি হলো।

মামাবাড়ি ফিরে মাকে সব বললাম। রবিনকে খেলনা কিনে দেওয়ার কথা বললাম। জাহানকে বেলুন দেওয়ার কথা বললাম। মা শুনে খুব খুশি হলেন। বললেন, ভালো করেছ। সবাইকে সাথে নিয়ে আনন্দ করার মজাই আলাদা। ■

নিবন্ধ

মুজিবনগর দিবস ও মুজিবনগর সরকার

মো. সিরাজুল ইসলাম

কিশোর আর খুদে বন্ধুরা, বাংলাদেশের প্রথম সরকার কবে কোথায় শপথ নিয়েছিল জানো? সেই সরকার কী কী কাজ করেছিলেন ? কেনইবা আমরা ১৭ই এপ্রিল পালন করি ? তাহলে শোনো, মুজিবনগর সরকারের কথা। স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা বাঙালির এ যাবৎকালের শ্রেষ্ঠ অর্জন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে একাত্তরের ১৭ই এপ্রিলও তেমনি এক অবিস্মরণীয় দিন। ঐতিহাসিক দিক থেকে দিনটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলাদেশের প্রথম সরকার গৌরবোজ্জ্বল মুক্তিযুদ্ধকালীন সকল প্রকার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, পরিচালনা করেছে দীর্ঘ নয় মাসের বীরত্বপূর্ণ সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ। বিপুল অস্ত্র সম্ভারে সজ্জিত দখলদার পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে নিরস্ত্র বাঙালিকে সশস্ত্র প্রশিক্ষণ দান, অস্ত্র সংগ্রহ, কূটনৈতিক তৎপরতা বিষয়ক কার্যক্রম সফলতার সাথে পালন করেছে ।

১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন পলাশির আমবাগানে স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়েছিল। সেই পলাশির আমবাগানের মাত্র ২৩ মাইল দূরে ২১৪ বছর পর, ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল তৎকালীন মেহেরপুর মহকুমার,ভবেরপাড়া গ্রামের বৈদ্যনাথতলার আরেক আমবাগানে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলার স্বাধীনতার অস্তমিত সূর্য আবার উদিত হলো। একাত্তরের ১৭ই এপ্রিল বাঙালির হাজার বছরের লালিত স্বপ্নের স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক ভিত্তিমূল রচিত হলো।

সমগ্র বাঙালি জাতি ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে ব্যালট বিপ্লবের মধ্যদিয়ে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী

মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ, মেহেরপুর

লীগকে রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে গণরায় দেয়। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ষড়যন্ত্র শুরু করে। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ১৯৭১ সালের ১লা মার্চ থেকে এদেশের রাষ্ট্রযন্ত্র অকার্যকর হয়ে পড়ে। একাত্তরের উত্তাল মার্চে সবকিছু চলতে থাকে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে। ৭ই মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বঙ্গবন্ধু দিলেন সেই কালজয়ী ভাষণটি। যা আজকে স্বীকৃত বিশ্ব ঐতিহ্য। রেসকোর্স ময়দানের ঐতিহাসিক ভাষণে বঙ্গবন্ধু যে ডাক দেন, সেই ডাকেই বাঙালি জাতি মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকে। ২৫শে মার্চ কালরাত্রিতে পাকিস্তানি বাহিনীরা নৃশংস গণহত্যা শুরু করে। ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

এরপর থেকে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে একাত্তরের প্রতিটি দিন-ক্ষণ ছিল যুদ্ধজয়ের লালিত স্বপ্নে উদ্বেলিত। ১৯৭০-এর নির্বাচনে বিজয়ী দল আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যরা সবাই মিলিত হলেন পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য ত্রিপুরার আগরতলায়।

বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহযোদ্ধা ও আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদ একাত্তরের ৩০শে মার্চ সন্ধ্যায় ভারতের পশ্চিম বাংলার সীমান্তে পৌঁছেন। ব্যারিস্টার আমীর-উল-ইসলামকে সঙ্গে নিয়ে ৩১শে মার্চ মেহেরপুর সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে পা রাখেন । মেহেরপুরের মহকুমা প্রশাসক তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী তাঁদের সহায়তা প্রদান করেন।

৫ই এপ্রিল তাজউদ্দীন আহমদ ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করে বাংলাদেশ সরকারকে ভারতে অবস্থানের অনুমতি, সরকার পরিচালনায় সহায়তা, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রের ব্যবস্থা; আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায় ও বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে আলাপ করেন।

১০ই এপ্রিল আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যরা ত্রিপুরার আগরতলায় এক যুক্ত অধিবেশনে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণার আলোকে গঠন করলেন স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ সরকার। ১০ই এপ্রিল তাজউদ্দিন আহমদের বেতার ভাষণে জানা গেল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপরাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দিন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী করে বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়েছে। পরদিন ১১ই এপ্রিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, আকাশবাণী, বিবিসি থেকেও এ খবর প্রচারিত হয়েছিল।

উল্লেখ্য, ১০ই এপ্রিল সরকার গঠনের পর ঐ সভায়ই সিদ্ধান্ত হলো সরকারের আনুষ্ঠানিক শপথ নিয়ে দখলদার বাহিনীকে পরাভূত করতে হবে এবং গোটা বিশ্বকে জানিয়ে দিতে হবে, বাঙালি তার আত্মপরিচয়ের ঠিকানা খুঁজে পেয়েছে। তখন সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধ চলছে সবখানে। ১১ই এপ্রিল সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো চুয়াডাঙ্গায়। ১৪ই এপ্রিল বাংলাদেশের সরকার প্রকাশ্যে শপথ গ্রহণ করবে। এ খবর জানতে পেরে দখলদার পাকিস্তানী বাহিনী চুয়াডাঙ্গায় ব্যাপক গোলা বর্ষণ করে। এরপর সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো মেহেরপুর মহকুমার বাগোয়ান ইউনিয়নের বৈদ্যনাথতলায় বাংলাদেশ সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ নেবে ১৭ই এপ্রিল ।

১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল ছিল শনিবার। বৈদ্যনাথতলা গ্রামে এক ছায়া ঢাকা আম বাগানে আয়োজন করা হয়েছিল উত্তেজনা, আনন্দ আর আশঙ্কা মেশানো এক অনুষ্ঠানের। মেহেরপুরের ভবেরপাড়া গ্রামের বৈদ্যনাথতলায়

সম্মাননা গ্রহণ করছেন মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম

আমবাগানের চারদিকে অস্ত্র কাঁধে কড়া পাহাড়ায় ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধারা। লাইন দিয়ে দাঁড়ানো মুক্তিযোদ্ধাদের কাঁধে শত্রু হরণের অস্ত্র, চোখে মুখে আগুন। চারদিকে হাজার হাজার মুক্তিকামী মানুষের উপচেপড়া ভিড়। কিছুক্ষণের মধ্যে আমবাগানটি জনারণ্যে রূপ নিল। দেশি-বিদেশি সাংবাদিকরাও প্রস্তুত। মুক্ত আকাশের নিচে চৌকি পেতে তৈরি করা হয়েছিল শপথ মঞ্চ। মঞ্চের ওপর সাজানো ছয়খানা সাধারণ চেয়ার। মেহেরপুরের তৎকালীন মহকুমা প্রশাসক তৌফিক-ই-ইলাহী কাঁধে স্টেনগান নিয়ে পায়চারি করছিলেন ।

নতুন রাষ্ট্রের নেতারা একে একে আসতে থাকেন। প্রথমে শপথ মঞ্চে উঠে এলেন বঙ্গবন্ধুর আজীবনের ঘনিষ্ঠ সহচর সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাঁর পেছনে আরেক সহচর তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী, এএইচএম কামারুজ্জামান, ও কর্নেল অব. এমএজি ওসমানী। অনুষ্ঠানের সূচনায় পবিত্র কোরান তিলাওয়াত এবং গীতা ও বাইবেল থেকে পাঠ করা হয়। স্থানীয় শিল্পী ও হাজারো মানুষের কণ্ঠে গাওয়া হয় বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি'।

পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি প্রাণপ্রিয় নেতা রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম উত্তোলন করেন স্বাধীন বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত জাতীয় পতাকা। এরপর আওয়ামী লীগ সংসদীয় দলের চীফ হুইপ অধ্যাপক ইউসুফ আলী ঐতিহাসিক দলিল স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন। এরপর নতুন সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মন্ত্রিবর্গকে শপথবাক্য পাঠ করান।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান- রাষ্ট্রপতি

সৈয়দ নজরুল ইসলাম-উপরাষ্ট্রপতি,

তাজউদ্দিন আহমদ-প্রধানমন্ত্রী, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

এ এইচএম কামারুজ্জামান-অভ্যন্তরীণ সরবরাহ ত্রাণ ও পুনর্বাসন

ক্যাপ্টেন মনসুর আলী-অর্থ বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ।

শপথ গ্রহণের পর সশস্ত্র তেজোদীপ্ত মুক্তিযোদ্ধারা ও আনসার বাহিনীর সদস্যরা মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবর্গকে রাষ্ট্রীয় কায়দায় গার্ড অফ অনার প্রদান করেন।

শপথ গ্রহণ শেষে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম তাঁর ভাষণে বলেন,

‘ আজ এই আম্রকাননে একটি নতুন জাতি জন্ম নিল। পৃথিবীর মানচিত্রে আজ নতুন রাষ্ট্রের সূচনা হলো, তা চিরদিন থাকবে।’

প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ বঙ্গবন্ধুর নামানুসারে বৈদ্যনাথতলার নামকরণ করেন ‘মুজিবনগর’।

পাকিস্তানের মতো একটি শক্তিশালী সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নয় মাসের মধ্যে বিজয় ছিনিয়ে আনাটা সত্যিই একটি কঠিন কাজ ছিল। আর এই কঠিন কাজটি সুচারুরূপে ও দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিল বাংলাদেশের প্রথম সরকার। মুজিবনগর সরকার যুদ্ধকালে গতিশীল প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তুলেছিল। আকারে ছোটো হলেও এ সরকার সুসংগঠিত ছিল। সরকারের দৈনন্দিন সব রকম কাজও এই সরকার দক্ষতার সাথে পালন করত। স্বল্পতম সময়ে তারা একটি বাজেটও প্রণয়ন করতে সমর্থ হয়েছিল ।

এ সরকার প্রচণ্ড প্রতিকূলতার মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছে, এক কোটি শরণার্থীর ত্রাণের ব্যবস্থা করেছে, মুক্তিপাগল ছাত্র জনতাকে প্রশিক্ষণ দিয়ে গেরিলা বাহিনি গড়ে পাকিস্তানিদের ত্রাস সৃষ্টি করেছে ,স্বাধীন বাংলা বেতারের মাধ্যমে বিশ্ব জনমত গড়ে তুলেছে । যার ফলে ১৬ই ডিসেম্বর আমরা পাই স্বাধীনতা, মুক্তির স্বাদ।

সীমান্তবর্তী নিরাপদ জায়গা মুজিবনগর বাংলাদেশ সরকারের প্রথম ঠিকানা, প্রথম রাজধানী। আমরা ১৭ই এপ্রিলকে ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস হিসেবে পালন করে থাকি। ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ ও ১৬ই ডিসেম্বরের মেলবন্ধন হচ্ছে ১৭ই এপ্রিল। মুজিবনগর সরকারের দূরদৃষ্টি ও দক্ষতার ফলে মাত্র নয় মাসে বাংলাদেশ দখলদার পাকিস্তানি বাহিনীকে অস্ত্রসমর্পণে বাধ্য করে। তাই আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে মুজিবনগর সরকার গৌরবোজ্জ্বল এক স্বর্ণালি অধ্যায় ।

তথ্যসূত্র:

১। হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত)স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।

২। ড. মো: মাহবুবর রহমান, বাংলাদেশের ইতিহাস:১৯৪৭-৭১,ঢাকা,নভেম্বর ২০০৬,পৃ.২৪২-২৫৮।

৩। মো: মুজিবুর রহমান, মুজিবনগর সরকার-স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার, সচিত্র বাংলাদেশ, ঢাকা, এপ্রিল ২০১৪,পৃ.৪৭-৪৯।

৪। খালেক বিন জয়েন উদ্দীন,আত্মপরিচয়ের প্রথম ঠিকানা-মেহেরপুরের বৈদ্যনাথ তলা, সচিত্র বাংলাদেশ, ঢাকা, এপ্রিল ২০১৪,পৃ.৫০-৫২।

৫। তানিয়া লাবণ্য, ডেটলাইন: মুজিবনগর, ১৭ই এপ্রিল , দৈনিক কালের কণ্ঠ ■

গল্প

দীপুর বন্ধু করোনা

মোনোয়ার হোসেন

দীপুর মন খারাপ।

সে বিকেলে ঘর থেকে বের হতে পারে না। মাঠে যেতে পারে না। খেলা করতে পারে না। মা ঘরের বাইরে যেতে নিষেধ করেছে। বলেছে, ঘরের বাইরে গেলে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হতে পারো। কয়েকদিন আগে করোনার জন্য ইশকুলও বন্ধ দিয়েছে। সে ছুটিতে দাদুবাড়ি যেতে চেয়েছিল। বাবা নিয়ে যায়নি। বলেছে, এই সময় কোথাও যাওয়া যাবে না। ঘরের ভেতর থাকতে হবে। বাইরে গেলে বা কোথাও বেড়াতে গেলে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হতে পারো।

দীপুর দম বন্ধ হয়ে আসে। উফ! সবার শুধু একটাই কথা - করোনা, করোনা আর করোনা ভাইরাস!

দীপুর মন খারাপ হয় । মন খারাপ করে সে বেলকোনিতে এসে দাঁড়ায় । মাঠের দিকে তাকায়। পড়ন্ত বিকেল। মাঠে কোনো ছেলেমেয়ে নেই। ফাঁকা মাঠ । মাঠ কাঁদছে। দীপুকে দেখে পিটপিট চোখে তার দিকে তাকায় । বলে, ও দীপুরে , তোরা এখন আর বিকেলে আমার

কোলে আসিস না কেন রে ? খেলা করিস না কেন রে? তোদের ছাড়া আমার যে কিছুই ভালো লাগে নারে ! আয়রে আয়, তোরা আমার কোলে আয়। কোলে বসে খেলা কর। লাফালাফি কর। দৌড় ঝাঁপ কর।

দীপুর বুকটা হু হু করে কেঁদে ওঠে। বলে, তোকে ছাড়া আমারও ভালো লাগে নারে মাঠ। মন চায় তোর কোলে ছুটে যাই । দুরন্তপনা করি। দৌড়ঝাঁপ করি। ক্রিকেট খেলি।

দুই হাত বাড়িয়ে দেয় মাঠ। আয়, আয় ,আমার কোলে চলে আয় । কোলে বসে খেলা কর।

দীপু বলল , যেতে পারব না।

মাঠ অবাক হয়ে বলল , কেন?

দেশে করোনা ভাইরাস এসেছে। বাইরে গেলে করোনা ভাইরাস আক্রমণ করবে।

সে কি ! করোনা ভাইরাস আবার কি ?

দীপু কিছু বলতে যাচ্ছিল। অমনি শুনল কে যেন হেসে উঠল। মিহি গলায়। চিকন সুরে।

দীপু অবাক হলো। কে হাসল ?

আবার হাসল। ওই মিহি গলায়। চিকন সুরে। হি হি হি।

দীপু চারপাশে তাকাল। কেউ নেই।

আবারও হাসল। হি হি হি।

এবার দীপু একটু ভয় পেয়ে গেল। দৌড়ে ঘরে যাবে অমনি তার নাম ধরে ডাকল। দীপু।

দীপু থমকে দাঁড়াল। ভয়ার্ত গলায় বলল, কে?

আমি।

কে তুমি?

আমি করোনা।

করোনা ভাইরাস?

হুমমম।

হাসছ কেন?

হাসব না? তুমি যেভাবে আমার সম্পর্কে মাঠকে বলছ, তাতে তো খুব হাসি পাচ্ছে আমার।

হাসি পাচ্ছে কেন ?

আমার সম্পর্কে মাঠকে মিথ্যা তথ্য দিচ্ছো বলে।

কী মিথ্যা তথ্য দিচ্ছি?

মানুষ বাইরে গেলে আমি আক্রমণ করি।

করো তো। তুমি তো রাক্ষস। দানব। ডাইনি। তুমি শুধু আক্রমণ করো না, মেরেও ফেল।

ভুল।

কি ভুল?

তোমার ধারণা।

ভুল কেন?

আমি সবাইকে আক্রমণ করি না। মারি না ।

কাদেরকে আক্রমণ করো না?

আমার বন্ধুদেরকে।

এতক্ষণে দীপু দেখল তার সামনে বেলকনিতে গ্রিলে বসে আছে করোনা। দেখতে সুন্দর। কদম ফুলের মতো। বলল, কারা তোমার বন্ধু ?

করোনা বলল, যে বেশি বেশি সাবান, হ্যান্ডওয়াশ, বা হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে বিশ সেকেন্ড সময় ধরে ভালোভাবে হাত ধুবে। হাত না ধুয়ে নাক, চোখ, মুখ স্পর্শ করবে না। হাঁচি-কাশি দেওয়ার সময় হাত বা হাতের কুনই দিয়ে মুখ ঢেকে হাঁচি দিবে। পরিষ্কার জামা-কাপড় পরবে। কাঁচা ফলমূল ভালো করে ধুয়ে খাবে। মাছ, মাংস, ডিম

ভালো করে সিদ্ধ করে খাবে। বেশি বেশি পানি পান করবে সে আমার বন্ধু।

দীপু বলল, ঠিক আছে আজ থেকে আমি বেশি বেশি করে সাবান বা হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে বিশ সেকেন্ড ধরে ভালোভাবে হাত ধুবো, হাঁচি-কাশি দেওয়ার সময় হাত দিয়ে মুখ ঢেকে নেব, পরিষ্কার জামা-কাপড় পরব, ফল-মূল ভালো করে ধুয়ে খাব, সিদ্ধ মাছ,মাংস,ডিম খাব, আর বেশি বেশি পানি পান করব।

তার কথা শুনে খুব খুশি হলো করোনা। বলল, আজ থেকে তুমি আমার বন্ধু।

করোনার বন্ধু হতে পেরে দীপুও খুব খুশি হলো। দৌড়ে ঘরে গেল । তারপর বাবার ফোন নিয়ে সব বন্ধুদেরকে ভিডিও কল দিয়ে বলল, কিভাবে করোনার বন্ধু হবে । ■

করোনা

তালবিয়া জিনাত

করোনা এক বৈশ্বিক মহামারি
আতঙ্ক নয়
চাই ধৈর্য ও সাহস
হবে হবেই জয়
থাকবে না কোনো আহাজারী।

এসো স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলি
সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখি
বার বার সাবান দিয়ে
হাত ধোয়ার অভ্যাস
গড়ে তুলি।

সবসময় ঘরে থাকি
বাইরে গেলে মাস্ক পরি
করোনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ি।

অষ্টম শ্রেণি, প্রগতি শিশু কানন, মিরপুর, ঢাকা।

সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন, পরস্পরের মধ্যে কমপক্ষে তিন (৩) ফুট দুরত্ব বজায় রাখুন।

বারবার সাবান পানি দিয়ে কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড হাত ধোবেন। অপরিচ্ছন্ন হাত দিয়ে মুখ, নাক ও চোখ ছোবেন না।

জ্বর, সর্দি, কাশি, গলা ব্যথা হলে বাড়িতেই আলাদা থেকে চিকিৎসা নিন।

মাস্ক পরি সুস্থ থাকি

মো. জামাল উদ্দিন

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-এর মতে, করোনাভাইরাসের সংক্রমণ মোকাবিলায় মাস্ক ব্যবহার করা জরুরি। এর সঙ্গে যথাযথভাবে মেনে চলতে হবে স্বাস্থ্য বিধির সব নিয়মকানুন। মাস্কটি তিন স্তর বিশিষ্ট কাপড়ের তৈরি হতে হবে। একজন অন্যজনের থেকে কমপক্ষে এক মিটার বা তিনফুট দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। সাবান পানি দিয়ে ভালোভাবে হাত ধুতে হবে এবং মুখ ও মাস্ক স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। মাস্ক ব্যবহারের কিছু পরামর্শ:

তোমাদেরকে যা করতে হবে

- মাস্ক স্পর্শ করার আগে সাবান পানি দিয়ে হাত ধুয়ে নিতে হবে
- মাস্কটি ছেঁড়া বা ময়লা কিনা তা দেখে নাও
- এমনভাবে মাস্ক ব্যবহার কর যেন তা এঁটে যায় এবং কোনো ফাঁক না থাকে
- মাস্কটি খেলার আগে হাত ভালো করে ধুয়ে নাও
- কানের বা মাথার পেছন দিকে ফিতা ধরে মাস্কটি খুলে নাও
- মাস্কটি পুনর্ব্যবহারের জন্য পরিষ্কার প্লাস্টিকের ব্যাগে রাখবে
- গরম পানি আর সাবান বা ডিটারজেন্ট দিয়ে মাস্ক পরিষ্কার করবে
- মাস্কটি মুখ থেকে খোলার পর হাত ভালো করে ধুয়ে নাও।

যা করা যাবে না

- ঢিলেঢালা মাস্ক ব্যবহার করবে না
- মাস্ক পরার সময় নাক বের করে রাখবে না
- ১ মিটারের মধ্যে অন্য কেউ থাকলে মাস্কটি খুলবে না
- শ্বাস নিতে কষ্ট হয় এমন মাস্ক ব্যবহার করবে না
- তোমার ব্যবহার করা মাস্ক অন্যকে ব্যবহার করতে দেবে না।

সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী মাস্ক ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক। কেউ যদি মাস্ক ব্যবহার না করে তাহলে সে জেল-জরিমানা বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হবে। ■

হই সচেতন

আরিফা আক্তার

করোনাকে ভয় পাব না
থাকতে হবে সচেতন
তার সাথে মানতে হবে
স্বাস্থ্য বিধি আর নিয়মকানুন।

বেশি বেশি হাত ধোবো
থাকব মোরা বাসায়
আরো লাগাম টানতে হবে
বাইরে আসা-যাওয়ায়।

৭ম শ্রেণি, বারৈখালীহাই স্কুল, মোড়লগঞ্জ, বাগেরহাট

ঘরের বাইরে মাস্ক পরা অত্যাবশ্যক এবং জরুরি

মাস্ক না পরলে জরিমানা করা হবে

অসাবধানতায় যে কেউ যে-কোনো সময় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হতে পারে

অসুস্থ হলে প্রয়োজনে ঘরেও মাস্ক ব্যবহার করতে হবে

নারকেল গাছে কিচিক পাখি

শাম্মী তুলতুল

নারকেল গাছের একটা ডালে মিতুর দৃষ্টি গিয়ে থামল। ওখানে একটা পাখি বসে আছে। পাখিটা কোন পাখি বুঝতে পারছে না সে। অনেক পাখি বইতে পড়েছে, ছবি দেখেছে। কিন্তু এই পাখি সে চিনতে পারছে না। পাখিটা দেখতে খুব আদুরে। একবার সবুজের ভেতর হারিয়ে যাচ্ছে আবার ভেসে উঠছে। আবার পায়ে ভর দিয়ে ছন্দে ছন্দে ছুটে বেড়াচ্ছে। মিতু তা দেখে খুব আনন্দ পাচ্ছে। মা জানতে চাইল কি করছিসরে, মিতু বলে দেখ মা কী সুন্দর একটি পাখি।

কই?

আমাদের নারকেল গাছের ডালে। এটি কি পাখি মা?

মা ভালো করে নজর দিয়ে দেখলেন। মা চিনতে পারলেন, বলেন হলদে পাখি।

বাহ সুন্দর নাম তো।

তোমাকে বিরক্ত করে না তো।

না মা, ও তো ভয়ে কাছেই আসে না।

থাক না এলে না আসুক দূর থেকেই দেখ। দূর থেকেই সুন্দর। মা বলে চলে যায়, মিতু রয়ে যায় তার ভাবনায়।

মিতু দুঃখ করে ইস যদি হাত বাড়ালে ধরা যেত পাখিটাকে। কিন্তু সম্ভব না।

আবার উড়ে গেল আকাশে, বোধহয় খুব তাড়া ছিল তার। মিলিয়ে গেল মেঘের ভেতর। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আকাশ পানে মিতু। দেখতে দেখতে তার চোখ বন্ধ হয়ে আসে। হতাশ হয়ে চলে আসে তার পড়ার টেবিলে।

পরের দিন আবার একই সময়ে ডাক শুনতে পেল মিতু পাখিটার। মিতু শব্দ শুনেই মহাখুশি।

মিতু ডাকল। আয় না আমার জানালার কাছে। খেতে দিব তুই যা খাস?

কিচিক। কিচিক।

তোকে ধরে রাখব না ভয় পাসনে। সত্যি বলছি। পাখিটা দিল ছুট আকাশে।

আহারে ভয় পেয়ে গেল। এরপর থেকে পাখিটাকে দেখলে মিতু আর কথা বলে না। যদি চলে যায় ভয়ে। তাই সে দূর থেকে চুপিচুপি দেখে। কিন্তু একদিন বন্ধুরা কি হলো জানো? পাখিটা কিচিক কিচিক করে শব্দ করছিল। মিতু ভাবল এমনি হয়ত। কিন্তু শব্দটা আরও বাড়ছিল। তখন মিতু উঁকি দিল বাইরে। অবাক ব্যাপার হলো পাখিটা মিতুকে দেখে তার দিকে হা করে তাকিয়ে থাকে খানিক। চোখ দুটোতে যেন কত ভাষা। বলতে চায় কত কথা। কিন্তু বলতে পারে না। মিতু বুঝতে পারে পাখিটা তার আদর বুঝতে পেরেছে।

মিতু তাকে আবার হাত নেড়ে ডাকে।

আয়না আমার কাছে, দেব আদর করে। দেব তুই যা খাবি তা।

পাখি বলে কিচিক।

সত্যি বলছি তোকে তুই যা চাইবি তাই দিব। একটি বার কাছে আয় । কত্ত ভালোবাসি তোকে। আদর লাগে তোকে।

কিচ কিচ কিচ করে পাখিটা আবার দেয় ছুট আকাশে। মিতু এইবার হাসে। পাখিটাও কিচিক কিচিক করে মাথা নাড়ে। একদিন মিতু খুব সুন্দর করে তার জন্য একটি ছবি আঁকে। ছবিটায় মনের মতো রং করে। পাখিটা প্রতিদিনের মতো নারকেল গাছের ডালে এসে বসে। মিতু বলে দেখ তোর ছবি এঁকেছি একদম তোর মতো,পাখিটা মাথা নাড়ায় আর দেখার চেষ্টা করে।

মিতু ধমক দিয়ে বলে, বুদ্ধু তুই এত দূর থেকে দেখবি কি করে, আমার জানলায় এসে বস দেখবি তখন ভালো করে। হলদে পাখি যেন মিতুর কথা বুঝতে পারল। শোউউউ করে মিতুর জানালার ছিটকিনির ওপর বসল। মিতু খুব উচ্ছ্বসিত। আহা! কী নরম কী তুলতুলে দেখতে।

মিতু তাকে আঁকা ছবিটা দেখাল। পাখিটা খানিক তাকিয়ে থেকে কিচ কিচ কিচ করে ঘুরান দিল। পাখা ঝাপটাল।

মিতু তার ঘুরপাক দেখে হাততালি দিল। বুঝল সে খুব খুশি নিজের ছবি দেখে।

তাই আনন্দে পাখিটি নেচে জানালা থেকে আবার উড়াল দেয় ডালে।

এভাবে মিতুর সাথে গভীর বন্ধুত্ব হলো হলদে পাখির। মিতু তাকে হলদে পাখি না বলে কিচিক পাখি বলে ডাকে।

প্রতিদিন মিতু পড়া শেষ হলে কিচিক পাখির সাথে গল্প করে। আর কিচিক পাখি মিতুর সারাদিনের গল্প শোনে কিচ কিচ করে। ■

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে

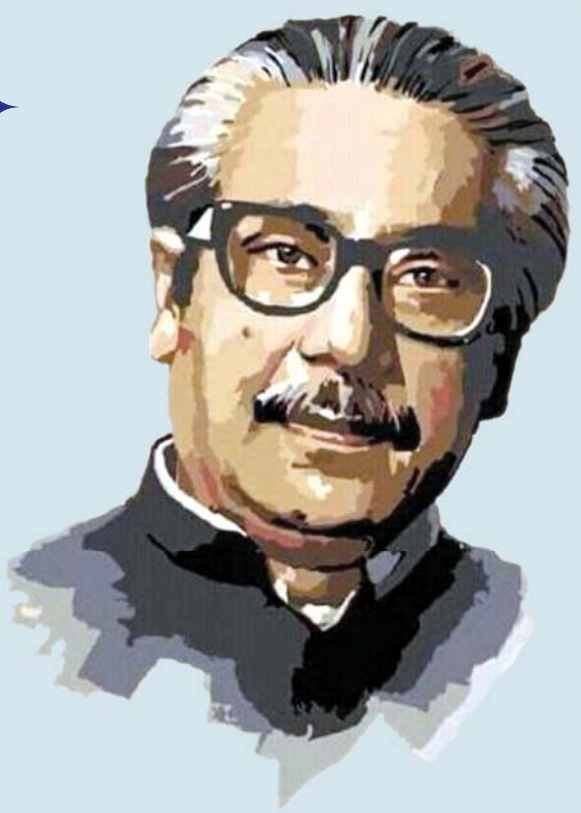

বঙ্গবন্ধু

নাসির উদ্দিন

ছোট্টখোকা বইয়ের মাঝে
দেখে একটা ছবি,
ভাবজগতে যায় পড়ে যায়
যেমনে পড়ে কবি।
ছবি দেখে খোকাবাবু
বেজায় খুশি হয়ে,
বারে বারে খায় চুমু
ছবি হাতে লয়ে।
কখনো সে বুকে নিয়ে
আদর করে বলে,
সারাজীবন মাল্য হয়ে
থাকবে আমার গলে।
ছবিটা কার কোথায় বাড়ি
খোকা জানতে চায়,
জানার জন্য বাবার কাছে
দ্রুত ছুটে যায়।
ছবি দেখে বাবা
বলেন শোনো জান,
উনি হলেন বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমান।

জাতির পিতা

নওমিনা ইসলাম

শেখ মুজিব তুমি দিয়েছিলে
স্বাধীনতার ডাক
সেই ডাকেতে বীর বাঙালি
লাগিয়ে দিল তাক।

শেখ মুজিব তুমি আমার
বাংলাদেশের নেতা
তুমি হলে প্রিয় বঙ্গবন্ধু
তুমি জাতির পিতা।

৫ম শ্রেণি, বিলচান্দক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, জেলা: পাবনা।

কবিতাগুচ্ছ

আনন্দ

আলমগীর কবির

কাঁঠাল পাতার ব্যাগ বানালাম
কলাপাতার বাঁশি,
বোনের হাতে তুলে দিলাম
ফুটল মুখে হাসি ।

খেজুর পাতার চরকি বানাই
আমের আঁটির ভেঁপু বানাই,
কাগজ কেটে ঘুড়ি বানাই;
ভাইয়ের হাতে তুলে দিয়ে
সুখ আনন্দে ভাসি।

বৃষ্টির অপেক্ষায়

আহমেদ রুমন

মেঘলা দিনে বাদলা আকাশ
ঝাপসা ছলে মাখা,
রাগ করেছে সূয্যি মামা
করবে না আজ দেখা।
গগনতলে মেঘ জমেছে
কালো রঙের ডোরে,
নীরদগুলো এপাশ ওপাশ
ছুটে বেড়ায় ঘোরে।
ভোর হতে আজ আকাশটারে
লাগছে ভীষণ আঁধার,
আসবে না-কি? ভিজিয়ে দিতে
বৃক্ষ, জমিন,পাহাড়?
গাছের ডালে শাখায় শাখায়
আমের মুকুল বেজায়,
ঊর্ধ্ব মুখে ফুলগুলো সব
জলদ অপেক্ষায়।

সতর্ক থাকতে হবে

নূর ইসলাম

চারিদিকে মহামারি
সবার মুখে করোনা
গরিব দুখি সবি ধরে
আপন বলে ছাড়ে না।
মাঠে দেখি ঘাটে দেখি
একটি আলোচনা
কাকে ধরে কাকে ছাড়ে
এটি হলো ভাবনা।
বাঁচতে হলে নিয়ম মেনে
কাশি সবাই দিবেন
এটা সেটা ধরে সবাই
হাত ধুয়ে নিবেন।
গুজব থেকে থাকব দূরে
আমরা সবাই বলি
বাঁচতে হলে নিয়মগুলো
সবাই মেনে চলি।

নতুন পৃথিবী

সাবরিনা আলম

নতুন সকাল নতুন আলো
কাটবে সকল আধার কালো
পুরনো যত দুঃখ অবসাদ
হয়ে যাবে অবসান
ইচ্ছাগুলো ডানা মেলে
উড়ে বেড়াবে তেপান্তরে
নতুন পৃথিবী সাজাব আমরা
নতুন করে

দশম শ্রেণি, উত্তরা হাই স্কুল, ঢাকা।

দিপু ও হরিণ

তারিকুল ইসলাম সুমন

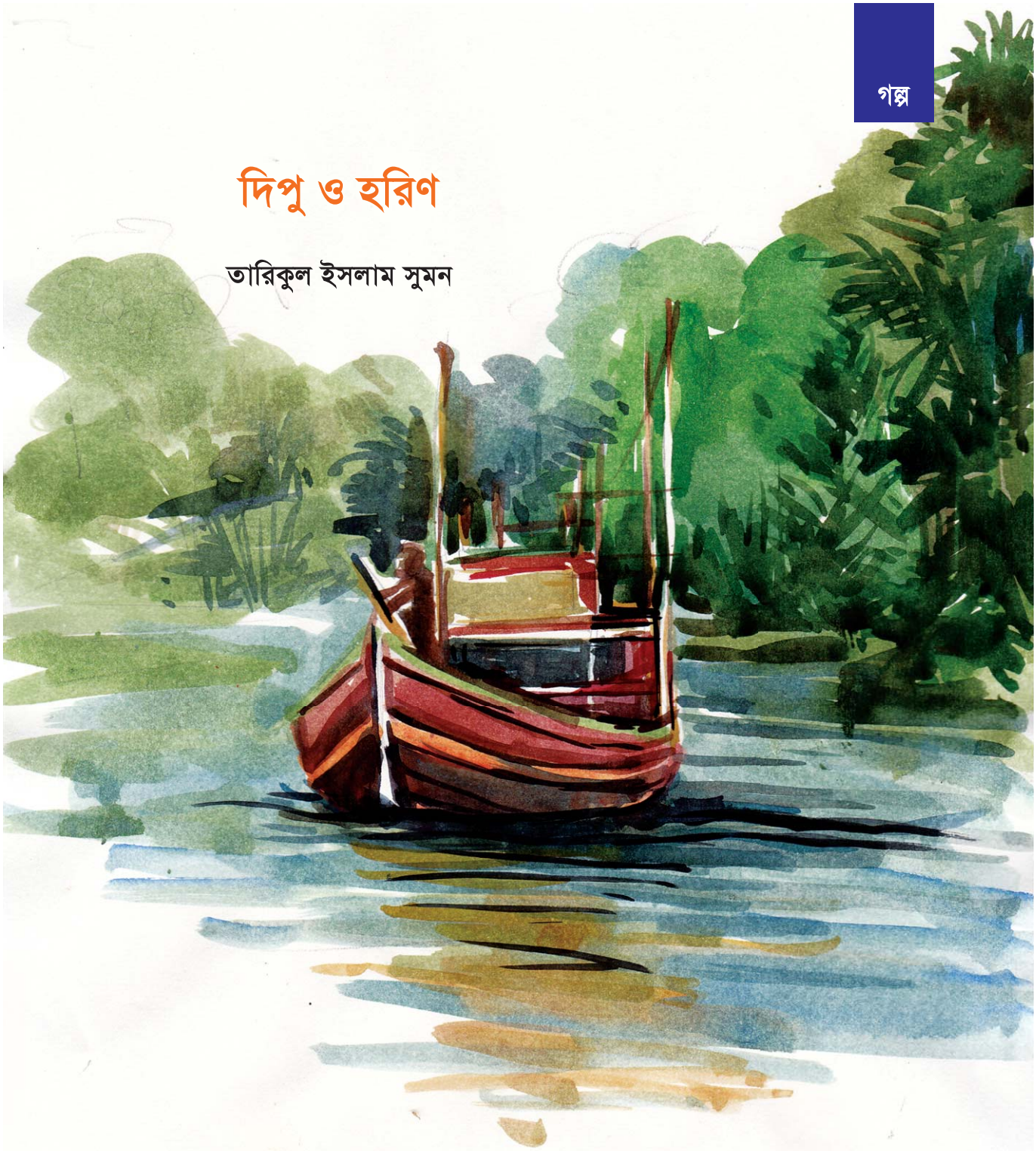

অনেকদিন পর বাবা-মা আর সুমি আপা মিলে গ্রামে যাবে দিপু। দিপুর জন্ম ঢাকায়। বি আই ইশকুলের তৃতীয় শ্রেনির ছাত্র সে। কাল সকালেই ট্রেন।

গ্রামের নাম নোয়াইলতলা। খুলনা শহর থেকেও বেশ দূরে। যে কয়েকটা দিন এখানে ওরা কাটায় খুব আনন্দ পায় দিপু। বেশিরভাগ সময়টাই দাদুর হাত ধরে কেটে যায়। ওয়াপদা বাঁধের দুপাশে সবুজ বন। বাবলা, কুচিকদম, শিশির আর শিশু গাছগুলো বেশ বড়ো হয়ে উঠেছে। এগুলোর ফাঁকে ফাঁকে অনেক ফলের গাছ। নিমগাছও বেশ চোখে পড়ে। ডালে ডালে শালিক, দোয়েল, ফিঙ্গে আর প্যাঁচাদের ডাকাডাকিতে মুখরিত এই বন। অনেক গাছের নাম জানে না দিপু। এটা কি ওটা কি বলে একে একে নাম জেনে নেয় সে। দাদুও কখনো বিরক্ত হন না। এবার গ্রামে আসার একটা উদ্দেশ্য রয়েছে দিপুর বাবার। কয়েকজন মিলে সুন্দরবন যাবে।

দুদিন পরেই ওরা তৈরি হলো। বেশ বড়ো একটা ট্রলার। মাটির তৈরি একটা চুলা ও কাঠ, পানির পাত্র ও হালকা বিছানাসহ প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র নিয়ে উঠে পড়ল সবাই। ট্রলার চলতে শুরু করলে হাত নেড়ে দাদুকে বিদায় দিলো দিপু। কিছু সময় চলার পর একটা ছোটো শহর দেখল দিপু। বাবার কাছে জানতে চাইল 'কি নাম ওখানকার।

'মোংলা বন্দর বাবা জবাব দিলো।

এভাবেই বাবার সাথে কথা বলা আর দুপাশের দৃশ্য দেখছিল দিপু। কোথাও নদীতে জাল ফেলে মাছ ধরছে জেলে। নদীর চরে সারসের দল একপায়ে শিকারের জন্য দাঁড়িয়ে আছে কোথাও। বালিহাঁসও চোখে পড়ল।

কালাবগি পার হয়ে ভয়াল শিবসা নদী। এখান থেকেই সুন্দরবন শুরু। দক্ষিণে যেতে শুধু সবুজ আর সবুজ। সুন্দরী, কেওড়া, গেওয়া, বাইন, গোলপাতা প্রভৃতি গাছের মাঝে বানরের দল ছুটাছুটি করছে। চিড়িয়াখানায় হরিণ দেখেছে দিপু, মুক্ত বনে হরিণ চরে বেড়ানো এই প্রথম দেখল সে। কান খাড়া করে কয়েকটা হরিণ তাদের দিকে তাকিয় আছে।

হরিণগুলো খুব সুন্দর তাই না বাবা?

শুধু হরিণ নয় এই বনের পাখি, বানর, কুমির, বাঘ, সাপ সবই খুব সুন্দর, বাবা হেসে জবাব দিলো। খুব লম্বা একটা কেওড়া গাছ। গত সিডরে হয়ত মাথাটা ভেঙেছে। সেখানেই বসে আছে প্রকান্ড এক পাখি। মাথাটা একেবারেই টাক। বাবার কাছ থেকে ওটার নাম জেনে নিল দিপু। ওটার নাম মদন টাক।

বনের ভেতর থেকে দুম করে একটা আওয়াজ ভেসে এল। ওটা যে হরিণ শিকারের আওয়াজ সবার আলোচনায় বুঝতে বাকি রইল না দিপুর। এতক্ষণে একটা হরিণ নিশ্চই ছটফট করছে। ভাবতে খুব কষ্ট হলো দিপুর।

বাবা, 'ওরা হরিণ শিকার করছে কেন?'

বাবার দিকে তাকাল দিপু।

এক ধরনের অসাধু লোক এই মৌসুমে হরিণ শিকারে আসে। মাংস সুস্বাদু, খুব গোপনে স্থানীয় বাজারে বিক্রিও করে থাকে। এটা খুব অন্যায়। এসব লোকের কারণেই আমাদের বন আজ সৌন্দর্য হারাচ্ছে। খুব ধীরে ধীরে কথাগুলো বলল দিপুর বাবা।

সকালে পিউ পিউ আওয়াজে ঘুম ভাঙল দিপুর। কড়মজল থেকে অনেক দুরে এসে ট্রলারটি নোঙর ফেলে এখানে রাত কাটিয়ছে তারা। বাবা এখনো ঘুমাচ্ছে। ঘুম জড়ানো চোখে দিপু দেখল ট্রলারের মেঝেতে একটা হরিণ চার পা বাঁধা পড়ে আছে। বাবাকে ডাকল সে। দিপুর বাবাও খুব অবাক হলেন। ব্যাপারটা জেনে নিলেন তিনি।

খুব ভোরেই ট্রলার থেকে নেমে গিয়েছিল কয়েকজন। কেওড়ার কচিপাতা পেড়ে তার নিচে শক্ত রশি দিয়ে ফাঁদ তৈরি করেছিল তারা। কচিপাতা খেতে এসেছিল অনেকগুলো হরিণ। আর তখনই আটকা পড়ে ওদের একটি। হরিণটা জবাই করার জন্য ছুরিটা ধার দিচ্ছেন একজন। বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে দিপু।

ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবলেন তিনি। তারপর হরিণটা ছেড়ে দেয়ার জন্য অনুরোধ করলেন সবাইকে। প্রথম প্রথম অনেকেরই দ্বিমত ছিল। পরে তিনি অনেক বোঝালেন। আমাদের সুন্দরবন আজ বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ। এভাবে আমরা যদি একের পর এক হরিণ মেরে ফেলি তাহলে এই বন হরিণশূণ্য হয়ে পড়বে। আর কোনো কারণে বনে হরিণ কমে গেলে বাঘের সংখ্যাও কমে যাবে। বনে বাঘ কমলে মানুষ গাছ কেটে উজাড় করে ফেলবে। এভাবে প্রভাব পড়বে সব কিছুর উপর। সবার বিবেক যেন হ্যাঁ হ্যাঁ বলে উঠল।

অবশেষে একটা সিদ্ধান্ত হলো হরিণটাকে দুবলার চরে নিয়েই ছাড়বে এবং দিপু নিজ হাতেই ওটা ছেড়ে দেবে। বাকি পথটুকু কচিপাতা খাওয়ানোর চেষ্টা করেছে দিপু। কিন্তু সে কেবল মুখ লুকিয়েছে আর ভয়ে কেঁপেছে।

বিকালে সবাই চরে নেমে এল। ঠিক ছোটো একটা অনুষ্ঠানের মতো। হরিণটার পায়ে বাধা রশিগুলো খুলে দিলো দিপু। একসাথে করতালি দিয়ে উঠল সবাই। এক দৌড়ে ছুটে পালাল হরিণটি। সুন্দরী গাছের ভেতর দিয়ে ঢুকে গেল গহিন বনে। খুশিতে দিপুর চোখ উজ্জল হয়ে উঠল। ছেলেকে কোলে নিয়ে আদর করছে দিপুর বাবা। ■

মেলা

মিহির হোসেন

বৈশাখি মেলা বসে
পাশের গ্রামের স্কুল মাঠে
অনেক মজা করতে করতে
চলে যায় মন আনন্দে হেঁটে।

কিনি অনেক ঘুড়ি খেলনা
খাই যে জিলাপি আরো কত কি
ফেরার সময় নিয়ে আসি
দাদুর প্রিয় মুড়ি মুড়কি।

বোনের জন্য নিয়ে আসি
নানান রঙের চুড়ি
দুই ভাই-বোন মিলে
উড়াই মেলায় কেনা ঘুড়ি।

৭ম শ্রেণি, মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা।

গল্প

দুষ্টু কাক
ও
মিষ্টি চড়ুই

ঝুমা আক্তার

পাশাপাশি দুটি বাসায় বাস করত কাক ও চড়ুই। কাকের বাসা বাঁশের ঝোপে। আর চড়ুইয়ের বাসা এক ছোটো আম গাছের ডালে। কাক ছিল খুব দুষ্টু। সব সময় চড়ুইয়ের ক্ষতি করার নেশায় থাকত। কি করলে চড়ুই বিপদে পড়বে এটাই ছিল কাকের ভাবনা। কাকের খারাপ ব্যবহার দেখেও চড়ুই কষ্ট পেত না। বরং সে সবসময় কাকের সাথে মিলেমিশে থাকার চেষ্টা করত। চড়ুই প্রায় সময়ই না খেয়ে থাকত। ঠিকমতো খাবার সংগ্রহ করতে পারত না।

আর দুষ্টু কাকের খাবারের অভাব হতো না। সে সারাদিনে যত খাবার সংগ্রহ করে তা খেয়ে আরো রয়ে যেত। চড়ুই মাঝে মাঝে কাককে বলত বন্ধু আমি না ভীষণ ক্ষুধার্ত। আমাকে একটু খাবার দিবে কি? কাক চড়ুইয়ের কথায় হাসাহাসি করে আর বলে, কোনো দুঃখে তোমাকে আমি খাবার দিব? আর আমি কি খাবার নিজ হাতে তৈরি করি যে তুমি চাইবে আর আমি দিয়ে দিব! কাকের কথা শুনে চড়ুই মন খারাপ করে আশেপাশে খাবারের সন্ধানে ঘুরছে। বেশ অনেকক্ষণ ঘুরাঘুরি করে ও কোনো খাবারের সন্ধান পেল না। অন্যদিকে দুষ্টু কাক বাসা থেকে বের হয়েই অনেক মজাদার খাবার সংগ্রহ করে ফেলে। কাক যেমন দুষ্টু তেমন চালাকও। চালাক বলেই তো কাকের খাবারের অভাব পড়ে না। মানুষের থেকে খাবার ছিনিয়ে নিয়ে আসে কাক। ছোটো বাচ্চাদের হাত থেকে বিস্কুট,পটেটো চিপ্‌স ঠোঁটে করে নিয়ে আসে।

কাক সব সময় নজর রাখে পাশের ঘরের বুড়িটা কখন রান্না বসাবে। বুড়ির পাতিল থেকে মাছ মাংস প্রায়ই দুষ্টু কাকটি নিয়ে আসত। চড়ুই যদি একটু খাবার খুঁজে আনত কাক তখন চড়ুইয়ের মন ভুলিয়ে অর্ধেক নিয়ে যেত। চড়ুই তো বোকা সে বুঝে না কাকের চালাকি। কাকের বাসা ছিল চড়ুয়ের বাসা থেকে একটু উঁচুতে। চড়ুই কখন কি করত দুষ্টু কাক তা চেয়ে চেয়ে দেখত। চড়ুই বাসায় না থাকলে কাক গিয়ে চড়ুইয়ের বাসা ভেঙে দিত। চড়ুই খুব কষ্ট করে পুনরায় বাসা ঠিক করত। এভাবেই কাক চড়ুইয়ের প্রতি অত্যাচার করে চলছে। কিছুদিন পর চড়ুইয়ের ঘরে ফুটফুটে এক বাচ্চা হলো। নিজের থেকে তার বাচ্চাকে বেশি ভালোবাসে। বাচ্চাকে বাসায় রেখে চড়ুই অনেক দূরে খাবার খুঁজতে যেত। নিজে না খেলেও তো বাচ্চাকে খাওয়াতে হবে। বাচ্চা বাসায় একা এরজন্য চড়ুই খুব চিন্তাও করত। কখন কি ঘটবে? কাক চড়ুইয়ের বাচ্চা দেখে হিংসায় জ্বলে পুড়ে শেষ। কাক মনে মনে অনেক কিছু ভাবছে কীভাবে চড়ুইয়ের ক্ষতি করা যায়।

সকালে ঘুম থেকে উঠেই কাক চড়ুইয়ের বাসার দিকে তাকিয়ে আছে কখন চড়ুই খাবার খুঁজতে যাবে। আর সেই সুযোগে তার বাচ্চাকে খাবে। চড়ুই কাকের মতলব বুঝতে পারেনি। সে খাবার খুঁজতে বের হলো। এই ফাঁকে কাক বাচ্চাকে ধরে খেয়ে ফেলল। বাচ্চাটি অনেক কান্নাকাটি করল। নিজের ভাষায় মাকে খুব ডাকল। মা শুনতে পেল না। মা চড়ুই তো খাবার খুঁজতে অনেক দূর গেছে। মিষ্টি চড়ুইয়ের বাচ্চা ছিল আরো বেশি মিষ্টি ও সুন্দর। ফুটফুটে তার চেহারা। বাচ্চাটি খেয়ে কাক দূরে উড়ে গেল। প্রতিদিনের মতো চড়ুই খাবার নিয়ে বাসায় ফেরার জন্য উড়তে শুরু করল। অন্যদিনের থেকে আজ বেশি খাবার পেয়েছে তাই চড়ুইয়ের মন খুশিতে ভরে গেল। বাসায় ঢুকতেই চড়ুইয়ের মুখ কালো হয়ে গেল। তার বাচ্চাকে দেখতে পাচ্ছে না।

এদিক ওদিক খুঁজলো বাচ্চাকে কোথাও পেল না। কাকের বাসাও দেখল কিন্তু কাকটা বাসায় নেই। চড়ুই কি করবে বুঝতে পারছে না। চড়ুই তার বাচ্চা হারিয়ে খুব কষ্ট পেয়েছে। বসে বসে কান্না করছে। হঠাৎ দেখে কাক বাসায়। কাককে বলল,কাক ভাই, কাক ভাই, আমার ফুটফুটে

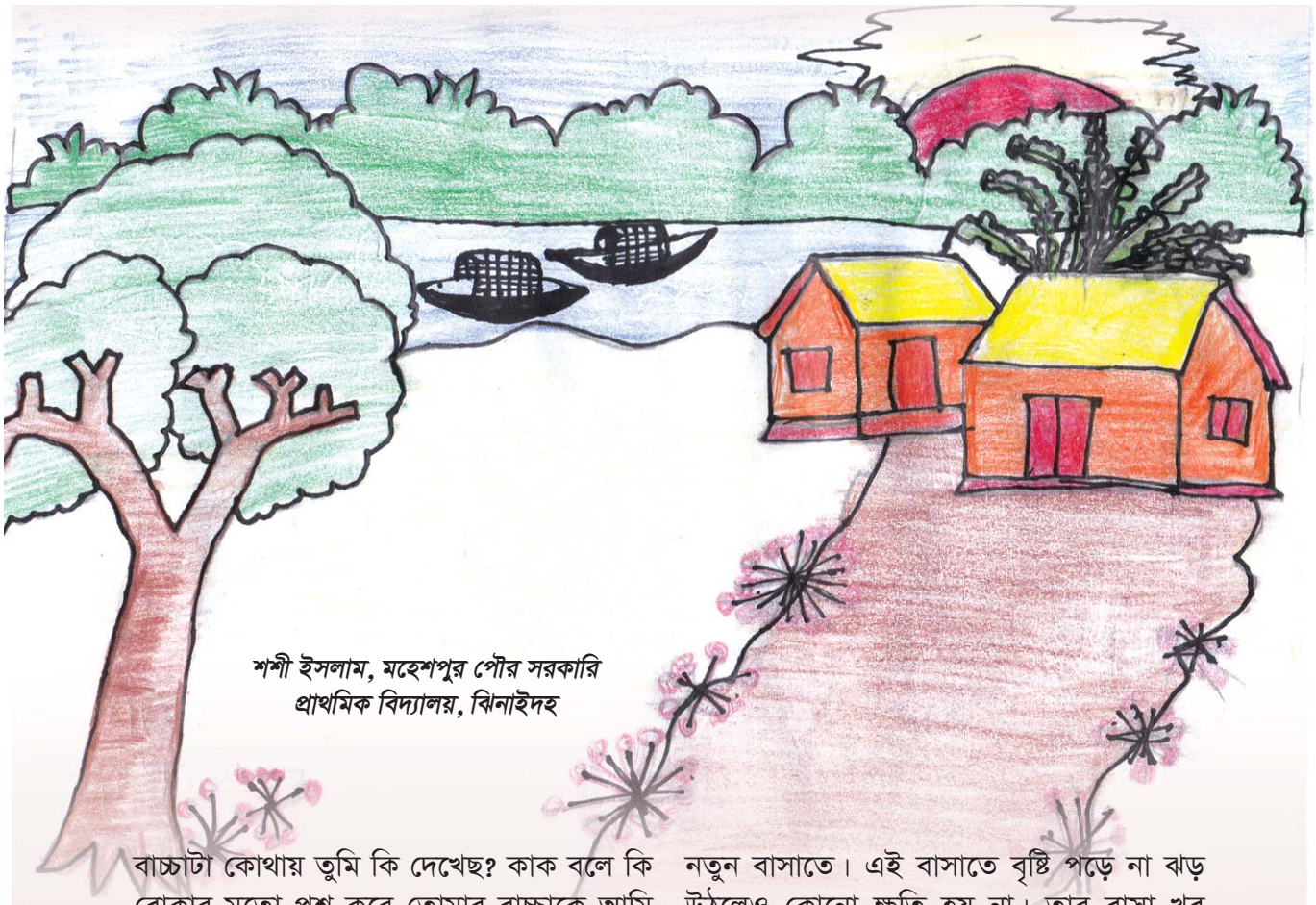

শশী ইসলাম, মহেশপুর পৌর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ঝিনাইদহ

বাচ্চাটা কোথায় তুমি কি দেখেছ? কাক বলে কি বোকার মতো প্রশ্ন করে তোমার বাচ্চাকে আমি কীভাবে দেখব! আমার কি খেয়ে দেয়ে কোনো কাজ নেই? উলটো চড়ুইকে বকাঝকা করছে দুষ্টু কাক। হঠাৎ চড়ুই কাকের বাসার পাশে পাখির পালক দেখতে পেল। খুব ছোটো পাখির বাচ্চার পালক। চড়ুইয়ের আর কিছু বুঝতে বাকি রইল না। কাক যে তার বাচ্চাকে খেয়েছে এ কথা চড়ুই বুঝে ফেলল। সে কাকের এই নির্মম ব্যাবহার দেখে কাককে একটা কথাই বলল, কাক তোমার এই চালাকি বেশি দিন থাকবে না। অন্যের ক্ষতি করার ফল একদিন তোমাকে ভোগ করতেই হবে। তুমি আমার বাচ্চাকে খেয়েছ, তুমি খুব দুষ্টু। তুমি ভালো না কাক তুমি ভালো না। এই বলে চড়ুই চলে গেল অনেক দূরে। সে আর দুষ্টু কাকের পাশে থাকে না।

দূরে এক বাড়ির ছাদে বাসা বাঁধল। চড়ুইয়ের ক্ষতি করে কাক তো ভীষণ খুশি। কাক খুশিতে জীবন যাপন করছে। চড়ুই ও বেশ সুখেই আছে নতুন বাসাতে। এই বাসাতে বৃষ্টি পড়ে না ঝড় উঠলেও কোনো ক্ষতি হয় না। তার বাসা খুব মজবুত। মাঝে মাঝে কাকের সেই চালাকির কথা মনে করে চড়ুই খুব কষ্ট পায়।

কিছুদিন পর এক রাতে খুব জোরে ঝড় উঠল। কাক তখন ঘুমাচ্ছিল। ঘুমে থাকা অবস্থায় কাকের বাসা ভেঙে কাক মাটিতে পড়ে গেল। ঘুমে ছিল তাই উড়তে পারেনি। কাকের একটি ডানা ভেঙে গেল। কিছুতেই কাকটা আর উড়তে পারে না। ভাঙা ডানা নিয়ে সে সারাক্ষণ বসে থাকে। খাওয়ার মতো কিছুই সংগ্রহ করতে পারে না। একদিন কাকের এমন অবস্থা চড়ুই দেখল। চড়ুইয়ের মনে হিংসে নেই। কাকের প্রতি সে রাগ দেখাল না। বন্ধু ভেবেই কাককে বলল, তোমার এ অবস্থা কীভাবে হলো। কাক তার দুঃখের কাহিনি সব বলল চড়ুইকে। অবশেষে না খেয়ে খেয়ে কাক মরে গেল। চড়ুইয়ের ঘরে আবার একটি বাচ্চা ফুটে। বাচ্চাকে নিয়ে মিষ্টি চড়ুই মহা সুখে দিন কাটাচ্ছে। ■

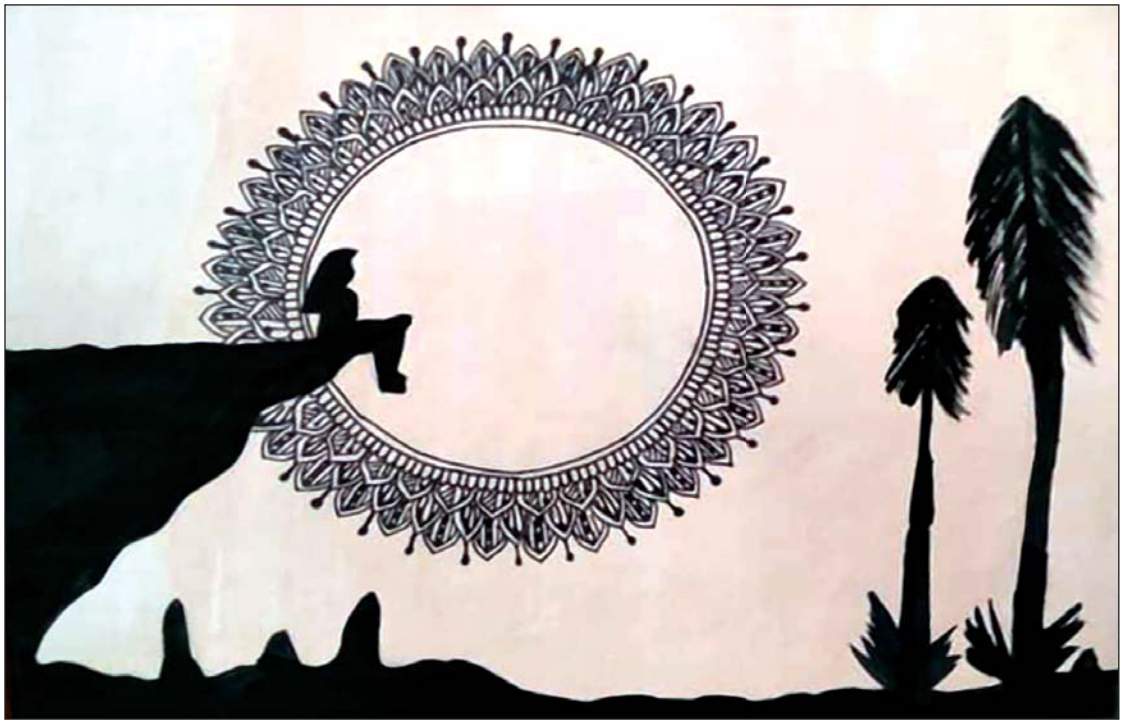

কাজী নাফিসা, দ্বাদশ শ্রেণি, ভিকারুন নিসা স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা।

তারিনা সুলতানা রিপা, অষ্টম শ্রেণি, সাউথ সন্দ্বীপ আবেদা ফয়েজ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম।

জীবাণু যুদ্ধ

লেখা ও আঁকা : কাজী তাবাসসুম আহমেদ

উহু! এখন থেকে নিয়ম মেনে চলতে হবে! যেমন-
বাসায় ফিরে ভিতরদিকে তবু নির্দেশনা দিচ্ছে
সাবান দিয়ে হাত ধোঁয়া
নিরাপদ পানি পান করা
খাবার ঢেকে রাখা
ফলমূল খাবার আগে ধুয়ে নিব
হ্যালো বস! আমাদের সব জীবাণু মারা যাচ্ছে!
কোনো এটাকে কাজ হচ্ছে না?!
কী বলোস!
একি হচ্ছে! এভাবে পরিষ্কার করলেতো আমরা ধ্বংস হয়ে যাব!
না না না
জীবাণুর বিস্তার রোধ করতে আমাদের পরিবেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা দরকার। সাবান এবং পানি দিয়ে নিয়মিত ধোয়ামোছা করে জিনিসপত্র থেকে জীবাণু দূর করা যায়।

গল্প

নীল ফড়িং ও টুনি

ইউনুস আহমেদ

সকালবেলা। জানালা খোলা। বাইরে ফুলের বাগান। হরেক রকম ফুল ফুটে আছে। জানালার

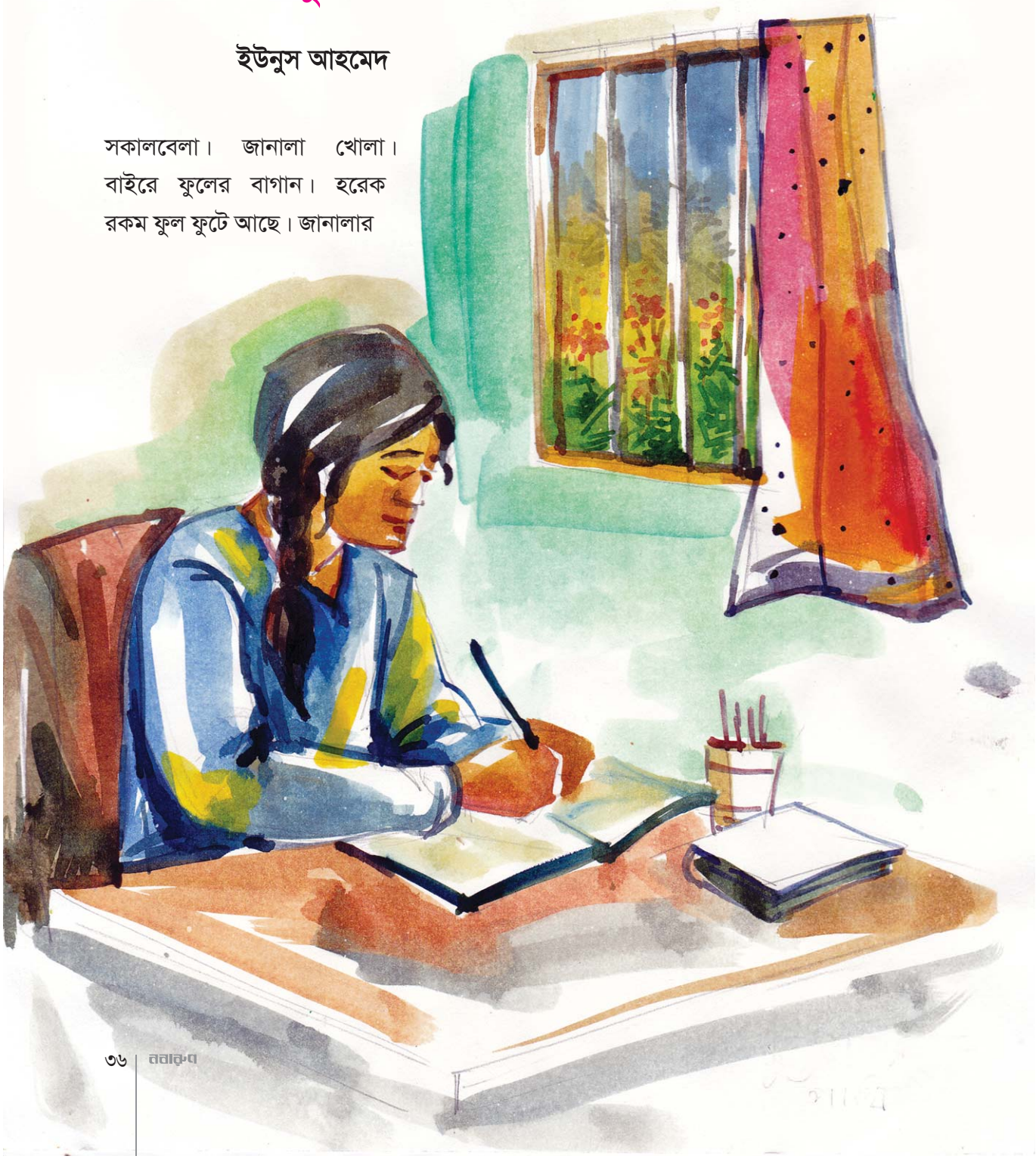

ধারে টেবিল। ছোট্টখুকি মুনমুনি পড়ছিল। প্রতিদিন ভোরে পড়তে বসে মুনমুনি। আজও বসেছে। মনোযোগ দিয়ে পড়ছে। ক্লাসের অনেক পড়া। সব পড়া শেষ করতে হবে। একটা ছড়া মুখস্ত করছে মুনমুনি। কিছুতেই মুখস্ত হচ্ছে না। খাতা টেনে লিখতে বসল মুনি। হঠাৎ এক নীল ফড়িং জানালা দিয়ে ঢুকে পড়ল। এসে বসল খাতার ওপর। একটু পরে টুনি পাখিটা এসে বসল বইয়ের ওপর। মুনি তো দারুন অবাক!

: আরে! তোমরা এখানে– মুনি বলল

: হ্যাঁ, এলুম-হাসতে হাসতে বলল টুনি।

: বাগানে উড়ে বেড়াচ্ছিলাম, দেখলুম তোমাকে। বিষণ্ন মনে বসে আছ। তাই এলুম। নীল ফড়িং হেসে বলল।

: তোমরা ঠিকই ধরেছে। আমি বসে পড়ছিলাম। কিন্তু তোমাদের কি বলব, আমার পড়াটা কিছুতেই মুখস্ত হচ্ছে না।

: কী পড়া তোমার, দেখি তো। মুনি বই খুলে দেখাল।

: ও ছড়া। ছড়া মুখস্ত হচ্ছে না। ছড়া তো অনেক মজার জিনিস। আমি তো অনেক ছড়া জানি। টুনিটা ফিক্ করে হেসে বলল।

: আমাকে বলো না, প্লিজ, প্লিজ। মুনি আবদার করল।

'ঠিক আছে' বলে টুনি তার ছড়ার ঝাঁপি খুলল। গুনগুন করে একটার পর একটা ছড়া আবৃত্তি করতে লাগল। মুনি তো ছড়া শুনে মুগ্ধ। টুনি এত চমৎকার করে ছড়া বলতে পারে! আর ওদিকে নীল ফড়িং কিন্তু একটুও বসে নেই । ছড়ার ছন্দে মনের আনন্দে নাচতে লাগল নীল ফড়িং। মুনির ছোট্ট পড়ার ঘর জুড়ে টুনি উড়তে লাগল আর ছড়া শুনাতে লাগল। সুন্দর সব ছড়া। আর নীল ফড়িং নাচতে লাগল। জানালা দিয়ে সকালের রোদের আলো এসে নীল ফড়িঙের পাখনার ওপর পড়ল। আর তাতেই ঝকমক করে ওঠল সব। নীল আলোয় ভরে ওঠল মুনির পড়ার ঘর।

একটু পরে মুনি, মুনি, ডাকতে ডাকতে ঘরে ঢুকল ওর মা। মা আদর করে ডাকে মুনি। বলল, কীরে পড়াটা মুখস্থ হয়েছে? মুনি বলে ফেলল, হ্যাঁ, মা। ওর মা বইটা টেনে নিয়ে বলল, বলো তো দেখি। মুনি গড়গড় করে ছড়াটা মুখস্ত বলে ফেলল। শুধু বইয়ের ছড়া না, বইয়ের বাইরের আরও অনেক ছড়া মুখস্ত বলল মুনি। মুনির মা তো অবাক! বলল, এত তাড়াতাড়ি ছড়া মুখস্ত হলো কী করে? মুনি বলল, টুনির কাছে শিখেছি। টুনিটা আবার কে? মা বলল। মুনি বলল, টুনিকে চেনো না। টুনি মানে টুনটুনি পাখিটা। 'কি যে বলছিস বাপ, মাথামুন্ডু কিছুই বুঝি না, বলে মা ঘর থেকে চলে গেলেন। মুনি জানালার কাছে এসে দাঁড়াল। দেখল নীল ফড়িং ওর বাগানে উড়ে বেড়াচ্ছে। আর টুনিটা গান গেয়ে চলছে। টুনিটা গানও গাইতে পারে। মুনি আরো অবাক হলো। মুনি মনে মনে বলল, আজ থেকে তোমরা আমার বন্ধু। তোমাদের সাথে আমি পড়ব, খেলব আর গান গাইব। ■

ভাষা দাদু

চান্দ্রবর্ষ সৌরবর্ষ

তারিক মনজুর

ফোনটা বাজতেই ভাষা-দাদু হাতে তুলে নিলেন। ওপাশ থেকে নেহার গলা শোনা গেল, 'আচ্ছা, দাদু, চান্দ্রবর্ষ আর সৌরবর্ষের মধ্যে পার্থক্য কী?'

ভাষা-দাদু তখন মাত্র রাতের খাওয়া শেষ করেছেন। ফোনটা পেয়ে তাঁর ভালোই লাগল। করোনা ভাইরাসের কারণে সবার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ রয়েছে। তাই কেউ ফোন করলে ভালোই লাগে।

'কই, দাদু, কথা বলছ না কেন? চান্দ্রবর্ষ আর সৌরবর্ষের কথা তুমি আগে শোনোনি?' ভাষা-দাদুকে চুপ থাকতে দেখে নেহা আবার প্রশ্ন করে।

চান্দ্রবর্ষ আর সৌরবর্ষের কথা নেহা আজ সন্ধ্যাতেই প্রথম জেনেছে। দেশে দেশে কীভাবে নববর্ষ পালিত হয়, এটাই সে পড়ছিল একটা বইয়ে। ওখানেই লেখা ছিল চান্দ্রবর্ষ আর সৌরবর্ষের কথা। কিন্তু এগুলোর পরিচয় বা ব্যাখ্যা বইতে দেওয়া ছিল না।

ভাষা-দাদু নেহার প্রশ্ন শুনে খুশি হলেন। বললেন, 'ঘরে বসে বইপত্র ভালোই পড়া হচ্ছে দেখি!'

'কী আর করব, বলো!' ফোনের ওপাশ থেকে নেহা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।

আসলে, ঘরে থাকতে থাকতে অস্থির হয়ে গিয়েছে নেহা। এর উপর খারাপ খবর হলো এ বছর বৈশাখি মেলা বসবে না। করোনাভাইরাসের কারণে স্কুলও বন্ধ। একা একা সময় কাটাতে হচ্ছে ঘরে বসে। অবশ্য খুব যে একা, তা বলা যাবে না। কারণ, ফেব্রুয়ারি মাসে বইমেলা থেকে অনেক বই কিনে এনেছিল। সেগুলোর সব তখন পড়তে পারেনি। এখন ঘরে বসে বাকিগুলো বেশ পড়তে পারছে।

ভাষা-দাদু বললেন, 'পৃথিবী তার নিজের অক্ষের উপর ঘুরছে। একবার ঘুরলে একটা দিন পূর্ণ হয়। এভাবে ৩৬৫ দিনে পৃথিবী একবার সূর্যের চারদিকে ঘুরে আসে। একে বলে সৌরবর্ষ।'

নেহা ফোনের ওপাশ থেকে বলল, 'এটা তো আমি জানি, দাদু। কিন্তু এটাকে সৌরবর্ষ বলে তা জানতাম না। কিন্তু চান্দ্রবর্ষ আবার কী?'

'সূর্যের চারদিকে পৃথিবী ঘুরছে। আবার পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে চাঁদ। সাড়ে ২৯ দিনে চাঁদ একবার পৃথিবীকে ঘুরে আসে। এভাবে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে আসলে চাঁদের এক মাস হয়। এভাবে ১২ মাস মানে ৩৫৪ দিনে চান্দ্রবর্ষ পূর্ণ হয়।'

নেহা বলল, 'সৌরবর্ষ থাকতে চান্দ্রবর্ষের প্রয়োজন কী?'

ভাষা-দাদু এতক্ষণ দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন। তিনি এবার চেয়ার টেনে বসলেন। বললেন, 'আগে যাযাবর, বেদুইনরা চাঁদ দেখেই মাস-বছরের হিসাব রাখত। প্রতিদিন একইভাবে সূর্য ওঠে, একইভাবে সূর্য ডোবে। তাই সূর্য দেখে দিন-মাসের হিসাব রাখা কঠিন। অথচ চাঁদ দেখে হিসাব রাখা যায় সহজে। কারণ, চাঁদ প্রতিরাতে একরকম থাকে না।'

নেহা জানালার কাছে এসে আকাশের দিকে তাকাল। চিকন এক ফালি চাঁদ দেখা যাচ্ছে আকাশে।

ভাষা-দাদু বলতে থাকেন, 'প্রথম দিনের চাঁদ অনেক সরু হয়। দ্বিতীয় দিনের চাঁদ আরেকটু মোটা হয়। এভাবে চাঁদ আস্তে আস্তে বড়ো হতে থাকে। একসময় চাঁদের পুরো পিঠ দেখা যায়। তখন তাকে বলে পূর্ণিমা। পূর্ণিমার পরে চাঁদ কমে যেতে থাকে। কমতে কমতে একসময় চাঁদের কোনো অংশ দেখা যায় না। তখন তাকে বলে অমাবস্যা। এভাবে এক অমাবস্যা থেকে আরেক

অমাবস্যায় চাঁদের এক মাস পূর্ণ হয়। আর এতে সময় লাগে গড়ে সাড়ে ২৯ দিন।'

'দাঁড়াও, দাদু', নেহা ফোনের ওপাশ থেকে বলে, 'ব্যাপারটা একটু বুঝে নিই। চান্দ্রবর্ষ চাঁদের উপর নির্ভর করে। আর সৌরবর্ষ সূর্যের উপর নির্ভর করে। তাই না?'

'ঠিক তাই।'

'চান্দ্রবর্ষ হয় ১২ মাসে। আবার সৌরবর্ষও হয় ১২ মাসে। তাই তো?'

'হ্যাঁ, তাই।'

'চান্দ্রবর্ষ হয় ৩৫৪ দিনে। সৌরবর্ষ হয় ৩৬৫ দিনে।'

'হ্যাঁ', ভাষা-দাদু ফোন কানে রেখেই মাথা ঝাঁকান, 'চান্দ্রবর্ষ হয় ৩৫৪ দিনে। আর সৌরবর্ষ হয় ৩৬৫ দিনে।'

'তার মানে', নেহা একটু হিসাব করে বলে, 'চান্দ্রবর্ষ আর সৌরবর্ষের মধ্যে ১১ দিনের পার্থক্য রয়েছে।'

ভাষা-দাদু বলেন, 'তোমার হিসাব এক্কেবারে ঠিক আছে।'

'কিন্তু, এর মধ্যে কোনোটা বেশি বৈজ্ঞানিক?' নেহা জিজ্ঞেস না করে পারে না।

'আজকের দিনে পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষ সৌরবর্ষ হিসাব করে চলে। সৌর ক্যালেন্ডারকে মানুষ বেশি বৈজ্ঞানিক বলে মেনে নিয়েছে। তবে, বিভিন্ন উৎসব পালনের জন্য অনেক মানুষ চান্দ্র ক্যালেন্ডার অনুসরণ করে। হিজরি সালের নাম শুনেছ। এটা চাঁদের হিসাবে চলে। ঈদ, রোজা, কুরবানি এসব চাঁদের উপর নির্ভর করে।'

'চান্দ্রবর্ষ আর সৌরবর্ষ কি একসাথে চলতে পারে?'

'কেন পারবে না? একসাথেই তো চলছে! তবে কারো সাথে কারো মেলে না। সৌরবর্ষের প্রথম মাস জানুয়ারি সবসময় শীতকাল। কিন্তু চান্দ্রবর্ষের প্রথম মাস মহররম। মহররম মাসের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট করে শীত বা গ্রীষ্ম বলা যাবে না।'

'কেন? কেন?' বেশ অবাক হয় নেহা।

'ব্যাপার আসলে ওই এগারো দিনের পার্থক্যের। প্রতিবছর চান্দ্রবর্ষ আর সৌরবর্ষে এগারো দিন করে ব্যবধান বাড়তে থাকে। এ কারণে লক্ষ রেখো, এ বছর গ্রীষ্মকালে রমজান পড়বে। কিন্তু একসময় ব্যবধান বাড়তে বাড়তে শীতকালে রমজান পড়বে।'

নেহা হয়ত আরো খানিকক্ষণ কথা বলত। কিন্তু ওর মা ডাক দিয়ে বললেন তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তে। নেহা তাই ভাষা-দাদুকে বলল, 'বুঝেছি।'

কী বুঝেছে, পরীক্ষা করার জন্য ভাষা-দাদু বললেন, 'তাহলে বলো দেখি, কোন ক্যালেন্ডার বেশি পুরনো – চাঁদের ক্যালেন্ডার, নাকি সূর্যের ক্যালেন্ডার?'

'কোনোটা আবার? চাঁদের ক্যালেন্ডার!'

ভাষা-দাদু খুশি হয়ে বললেন, 'ঠিক। যখন মানুষের হাতের কাছে ক্যালেন্ডার ছিল না, তখন চাঁদই ছিল দিন-তারিখ হিসাব রাখার ভরসা।'

'তাহলে, দাদু, রাখি? শুভ রাত্রি।'

ভাষা-দাদুও 'শুভ রাত্রি' বলে ফোনটা রেখে দিলেন। ■

শিশুর পছন্দ-অপছন্দকে প্রাধান্য দিতে হবে

মাহমুদুর রহমান খাঁন

জন্মের পর থেকে তিলে তিলে বেড়ে উঠতে শুরু করে একটি শিশু। ধীরে ধীরে পারিবারিক এবং সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি সংশ্লিষ্ট হতে শুরু করলে সেই বিষয়গুলোতে শিশুটির পছন্দ এবং অপছন্দ প্রকাশ পেতে থাকে। এভাবে শিশুকাল হতেই তার নিজস্ব একটি সত্তা তৈরি হয়ে ওঠে। অত্যন্ত নিকট অভিভাবক হিসেবে এ সময়টিতে শিশুটির বাবা-মা ও পরিবারকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হয়। কেননা শিশুর পছন্দ এবং অপছন্দের উপর তার ভবিষ্যত অনেকাংশেই নির্ভরশীল।

তাই এসময় শিশুটির বাবা-মাকে বুঝতে হবে তাদের সন্তান কী চায়, কী খেতে পছন্দ করে এবং কী অপছন্দ করে। কেননা এই বিষয়গুলো জানার মাধ্যমেই সন্তানকে সঠিক ও সুন্দরভাবে বেড়ে উঠতে সহায়তা করা সম্ভব। সন্তানের সুস্থ মানসিকতার উপর নির্ভর করে তার সুন্দর ভবিষ্যত। সন্তানের পছন্দ ও মতামতকে প্রাধান্য দিলেই মানসিকভাবে সে তার কাজে সফল ও মনযোগী হতে পারবে। অন্যথায় তার প্রতিভার অপচয় ঘটতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, অনেক বাবা-মা তাদের সন্তানকে ছোটোবেলায় নাচের কিংবা গানের স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই বুঝতে পারেন না অথবা পর্যবেক্ষণ করেন না গান ও নাচের মধ্যে উভয় বিষয়েই নাকি যে-কোনো একটি বিষয়ে তার সন্তানের আগ্রহ বেশি এবং প্রতিভার ছাপ রয়েছে। যদি তারা শিশুর আগ্রহের বিষয়টিকে এক্ষেত্রে প্রাধান্য দেন তাহলে শিশুটি আরো আনন্দের সাথে তা শিখে সফল হতে পারবে।

এমনকি হাই স্কুলে শিক্ষার বিভাগ নির্ধারণ করা নিয়েও অনেক ক্ষেত্রে সন্তানদেরকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পরিবার এবং আত্মীয়-স্বজন দ্বারা প্রভাবিত হতে দেখা যায়। এ বিষয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যাবসায় শিক্ষা বিভাগের মধ্যে সন্তানের কোনটি পছন্দ এবং ভবিষ্যতে সে কি হতে চায় তার প্রাধান্য দেয়া হয় না। তবে পছন্দের ক্ষেত্রে বাবা-মা ও স্বজনদের একেবারেই যে ভূমিকা নেই তা কিন্তু নয়। তাঁরা কোনো বিভাগ কেমন, কোন বিভাগে পড়ে কী শিক্ষালাভ করা যায় এবং কোনটাতে পড়লে ভবিষ্যতে কী হওয়া যাবে এসব বিষয় নিয়ে সন্তানের সাথে আলোচনা করতে পারেন। এতে সন্তান ভবিষ্যত সম্পর্কে আগেভাগেই খুব ভালো ধারণা পাবে এবং স্বপ্ন পূরণে একধাপ এগিয়ে যাবে।

মানব সন্তানদের সকলে জন্ম থেকে মেধাবী হয়েই পৃথিবীতে আসে না। তবে কেউ কেউ জন্ম থেকেই প্রখর মেধাবী হয়, আবার কেউ সঠিক পরিচর্যার মাধ্যমে মেধাবী হয়ে ওঠে। তবে প্রতিটি শিশুই জন্মের পর আইনস্টাইন, নিউটন এবং হকিং হওয়ার ক্ষমতা রাখে। সমাজসৃষ্ট চাপ বা পরিবারের দ্বারা শিশুর প্রতিভার অবমূল্যায়নের ফলে অনেক প্রতিভাই অকালে ঝরে যায়। তাই পরিবারকে বুঝতে হবে কী উপায়ে সন্তানের প্রতিভা বিকশিত করা সম্ভব। এজন্য বাবা-মায়ের উচিত সন্তানের পছন্দকে প্রাধান্য দেয়া। উদাহরণস্বরূপ, বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান যদি তার বাবার পছন্দানুযায়ী ফুটবল খেলতেন তাহলে ক্রিকেটে সফলতা দেখিয়ে বিশ্বসেরার মর্যাদা হয়ত কখনো লাভ করতে পারতেন না। মুস্তাফিজুর রহমান যদি পড়াশুনা নিয়েই বসে থাকতেন হয়তবা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার এসব হতে পারতেন কিন্তু ক্রিকেটার হয়ে যতটুকু সফলতা পেয়েছেন ততটুকু সফলতা হয়ত পেতেন না কখনোই। কেউ ডাক্তার হয়ে সফল হয়, কেউবা ইঞ্জিনিয়ার হয়ে, আবার কেউ কেউ সমাজের গতানুগতিক ধারার বাইরে যেয়ে অন্য কোনোভাবে সফলতা অর্জন করে।

বাবা-মায়ের দায়িত্ব প্রতিটি বিষয়ে তাদের সন্তান কী পছন্দ করে এবং কী অপছন্দ করে তা সম্পর্কে বোধগম্য থাকা। সন্তানের পছন্দ-অপছন্দের প্রতিটি বিষয়ের ভালো এবং মন্দ উভয় দিক নিয়েই তাদেরকে ভাবতে হবে এবং সন্তানকে তা বোঝাতে হবে। এজন্য শিশুর জন্মের পর থেকে প্রতিটি বাবা-মায়ের দায়িত্ব সন্তানের পছন্দ এবং অপছন্দের বিষয়গুলো চিহ্নিত করে তাদেরকে বেড়ে উঠতে সহযোগিতা করা। তাহলেই প্রতিটি শিশু মেধা বিকশিত করে সারা বিশ্বে স্বপ্রতিভার ছাপ রাখতে পারবে। ■

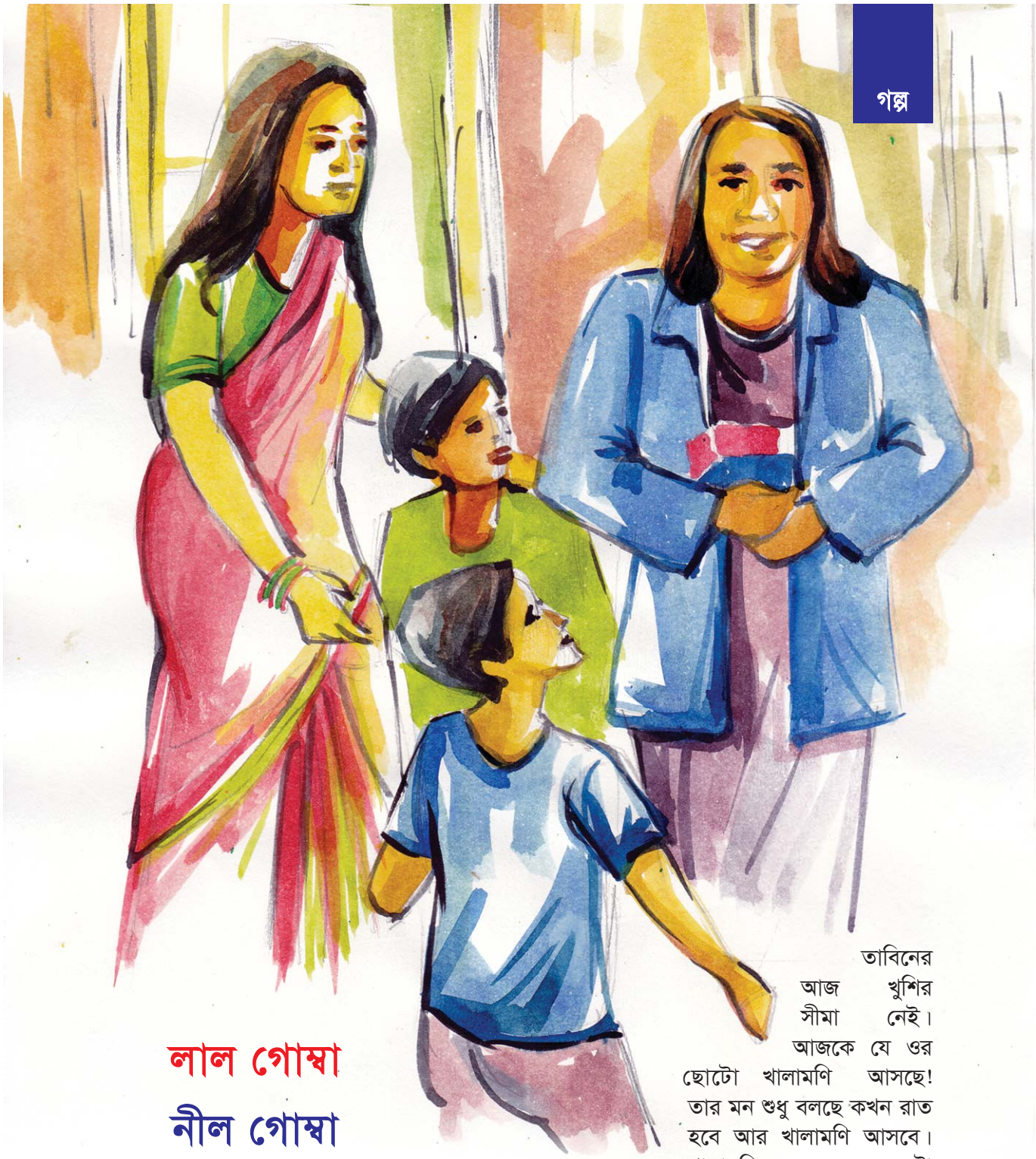

লাল গোম্বা নীল গোম্বা

মুমতাহিনা জাহান

তাবিনের আজ খুশির সীমা নেই। আজকে যে ওর ছোটো খালামণি আসছে! তার মন শুধু বলছে কখন রাত হবে আর খালামণি আসবে। খালামণি এসে ওকে একটা সারপ্রাইজ দেবে বলেছে। ওর খালামণি মিষ্টি রহমান বিদেশে মিথোলজি নিয়ে গবেষণা করছেন। তাবিনের বড়ো ভাই তাফিম।

সে তাবিনকে বলল, 'জানিস খালামণি গোম্বা নিয়ে গবেষণা করছে।'

তাবিন বলল, 'ভাইয়া, গোম্বা কী?'

'মাথাটা বিশাল বড়ো, হাত-পা ছোটো এমন গ্রিক মিথোলজিকাল ক্যারেক্টার।'

তাবিন আবারো জিগ্যেস করল, 'ভাইয়া, গ্রিক মিথোলজি কী?'

'তোকে আমার এ ব্যাপারে বলাই ভুল হয়েছে! খালামণি আসলে তাকেই সব প্রশ্ন করিস, আমার এখন অনেক পড়া!'

আরও কিছু হয়ত সে বলতে চেয়েছিল, কিন্তু না বলেই তাবিনকে ভেংচি কেটে চলে গেল।

রাত সাড়ে নয়টা বাজে। হঠাৎ তাবিনদের বাড়ির দরজার কলিং বেল বেজে উঠল। তাবিন দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলল। কিন্তু এ কি! তাবিনের বাবা আর বড়োমামা একা দাঁড়িয়ে আছেন কেন?

তাবিনের মা তৃণা রহমান বলল, 'তোমরা একা কেন? মিষ্টি কোথায়?'

একটু বাদেই মিষ্টি এল; সঙ্গে এক মোটা মহিলা। মহিলার চোখে কাঠিন্য, কি সব আজব ভাষায় কথা বলছে! তৃণা জানতে চাইল মহিলাটি কে?

'আমার সেক্রেটারি।' উত্তর দিলেন মিষ্টি খালামণি।

তাফিম বলল, 'খালামণি তুমি কেমন আছ?'

'আমি ভালো, তুই কোন ক্লাসে পড়িস?'

'আমি ক্লাস সেভেন আর তাবিন ফোরে।'

'ওহ হো, তাবিন, তাবিন কোথায়?'

তৃণা রহমান বললেন, 'তোর জন্য সারাদিন অপেক্ষা করে এখন ঘুমিয়ে পড়েছে।'

সঙ্গে সঙ্গে তাফিম বলে উঠল, 'খালামণি, ভালোই হয়েছে, না হলে তাবিনের প্রশ্নবাণে তুমি জর্জরিত থাকতে। তুমি যে ওকে ছোটোবেলায় বিজ্ঞানী সাহেব ডাকতে, এখন তো মনে হয় দেশের বিখ্যাত কোনো বিজ্ঞানী হয়ে গেছে। সারাদিন এই ফরমুলা, ঐ মটর, এটা সেটা নিয়ে লেগেই থাকে। ওর ঘরটাকে দেখলে মনেহয় একটা সায়েন্স ল্যাবরেটরি।'

রাত সোয়া এগারোটা। সবাই বসে টেবিলে খাচ্ছে। তাবিনের চোখে ঘুম ঘুম ভাব। আসলে না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিল। মা তাকে ডেকে তুলে খাওয়াচ্ছেন। তাই হয়ত...।

মিষ্টির সেক্রেটারি বুলগেরিয়ার নাগরিক। বছর পাঁচেক হলো জার্মানিতে আছেন। মিষ্টি রহমান বললেন, মেয়েটি তার এক বছরের জুনিয়র।

তাবিনের মায়ের মুখে বিস্ময়ের ছায়া। আসলে মহিলাকে দেখলে মনে হয় মিষ্টির থেকে অন্তত তিন বছরের বড়ো।

রাত তিনটা। হঠাৎ তাবিনের রুমের দরজায় কে যেন কড়া নাড়ল। তাবিন দরজা খুলল।

'আরে ভাইয়া, তুমি! এত রাতে কেন?'

'আস্তে, চেঁচাবি না। শোন, এমন একটা কথা বলতে এসেছি, না শুনেই একেবারে নেচে উঠবি।'

'কী হয়েছে বল?'

'খালামণি সাথে করে যে মোটকু মহিলা এনেছেন, তাঁর কাছে দেখলাম দুইটা কাচের বাক্স। তাতে লাল-নীল কী যেন জ্বলজ্বল করছে। দেখলাম বাক্স দুটোকে নিয়ে একটা সিন্দুকে ভরে রাখছেন। আমার মনে হয় ঐ দুইটা গোম্বা।'

'বলো কি! কিন্তু ইন্টারনেটে তো দেখলাম গোম্বা বলতে কিছুই নেই?'

'গোম্বা নেই, কিন্তু ঐ ধরনের কোনো প্রাণী তো আছে।'

তাবিন সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'যেমন হাইড্রা!'

তাফিম বলল, 'মাত্র একদিনেই মিথোলজি সম্পর্কে ভালোই জেনেছিস।'

'ঐটা দেখবার তো কোনো উপায় নাই, তালা দেওয়া নিশ্চয়ই?'

'আরে মাথামোটা, তুই যে লোহা গলানোর কেমিক্যালটা বানিয়েছিস! ভুলে গেলি?'

‘ওহ হো, হ্যাঁ! কিন্তু মহিলার ঘরের দরজা তো ভেতর থেকে বন্ধ।’

তাফিমের মুখে চিন্তার ছাপ। কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে সে বলল, ‘তুই লাফিং গ্যাস বানাতে পারবি?’

‘একদিন সময় দাও, আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি।’ তাবিন উত্তর দিলো।

দুই ভাইয়ের কথোপকথন শেষ। দূর থেকে ফজরের আজান শোনা যাচ্ছে। সবাই নামাজের জন্য তৈরি হচ্ছে। মসজিদে যাওয়ার পথে ওদের বাবা জিগ্যেস করলেন, কী রে, রাতে ভালো করে ঘুমাসনি? দুজনের চেহারা এত ফ্যাকাসে লাগছে কেন?’

তাফিম হকচকিয়ে উত্তর দিলো, ‘তাবিন, রাতে ভয় পেয়েছিল। তাই আমি ওর সঙ্গে থেকেছি। তখন রাত তিনটা। তাই আর কারোরই ঘুম হয়নি।’

ওদের বাবা আর কিছু বললেন না।

নামাজ শেষে ঘরে এসে দুজনকেই ঘুমাতে বললেন। স্কুল বন্ধ। বেলা বারোটায় উঠলেও সমস্যা নেই। তবে দুই ভাইয়ের কারোর চোখেই ঘুম নেই। একজনের সাথে শুয়েছে ওদের মা, আরেকজনের সাথে কাজের মেয়ে মিলু।

মায়ের সাথে শুয়ে তাফিম শুধু ভাবছে, তাবিনটা কী পারবে? এখন তো ওর ঘরেও যেতে পারবে না।

এদিকে তাবিন খেয়াল করল, ওকে পাহারা দিতে এসে মিলু নিজেই ঘুমিয়ে পড়েছে। এটাই তো সুযোগ। দরজাটা হালকা খুলে দেখে নিল সবার অবস্থান। মা তাফিমের ঘরে, খালামণি নিজের রুমে বুলগেরিয় মহিলার সঙ্গে কাগজ কলম নিয়ে কী যেন করছেন।

তাবিন কাজে লেগে গেল। তিন চার ঘণ্টার মধ্যেই একটা ওষুধ বানিয়ে ফেলেছে সে। আসলে অনেকদিনের ইচ্ছা ছিল লাফিং গ্যাস বানাবার। এ নিয়ে ইন্টারনেটে ঘাঁটাঘাঁটিও করেছে অনেক। প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো আগেই সংগ্রহ করেছিল টাকা জমিয়ে। কিন্তু ও কী সফল হয়েছে? কার উপর প্রয়োগ করে পরীক্ষা করবে?

তারপর হঠাৎ চোখ পড়ল মিলুর দিকে। মুখে মাস্ক পরে আস্তে আস্তে মিলুর কাছে গিয়ে ওকে ডাকতে লাগল। মিলু জেগে উঠতেই শো করে ওর মুখের সামনে কেমিক্যালটা স্প্রে করে দিলো। এক মিনিট পার হয়ে গেল, কিন্তু কিছুই তো হলো না! তাবিনের মুখটা যেই হতাশ হতে শুরু করেছে, অমনি মিলু হাসি শুরু করল। ওর হাসি শুনে আশপাশের ঘর থেকে সবাই চলে এল। সবাই মিলুকে দেখে অবাক। মেয়েটা পাগল হয়ে গেল নাকি?

এদিকে তাবিন সারা ঘরে লাফিং গ্যাস ছড়িয়ে দিতে লাগল। ততক্ষণে বাসার সবাই অট্টহাসিতে মশগুল। তবে একটা সমস্যা হয়ে গেছে। তাফিমও তো লাফিং গ্যাসের কবলে। ওকে ছাড়া চলবে না তো?

মুখে পানি দিয়ে তাফিসের হাসি থামানোর চেষ্টা করল তাবিদ। চেষ্টা করল।

কাচের বাক্সগুলো তখন তাবিনের পড়ার টেবিলের উপর। আলো নিভিয়ে দিতেই ওগুলো কেমন যেন জ্বলজ্বল করে উঠল। একটার ভেতরে লাল রঙের বড়ো মাথাওয়ালা প্রাণীর প্রতিচ্ছবি। কিন্তু হাত-পা একদম ছোট্ট। অন্যটা নীল রঙের। সবাই জিজ্ঞেস করলো, ‘এগুলো কী?’

কাজ হলো না দেখে গামছা নিয়ে মুখের সামনে ধরে অন্য ঘরে নিয়ে এল। হুশ ফিরতেই তাফিম বলল, 'কী হয়েছে? লাফিং গ্যাস বানিয়েছিস?

'হ্যাঁ, কাজ শুরু করে দিয়েছে। তুমিও এতক্ষণ এর প্রভাবে ছিলে। সময় নেই,

এর প্রভাব আধাঘণ্টা থাকবে। আর বিশ মিনিট সময় আছে।'

দুজন মিলে বুলগেরিয়ান সেক্রেটারির ঘরে গেল। লোহা গলাবার উপাদান দিয়ে সিন্দুকের তালা খুলে আস্তে করে বাক্স দুটো বের করল। কিন্তু একি? ভিতরে তো কিছুই নেই! একেবারে খালি বাক্স! দুজন মিলে পুরো ঘর খুঁজল। অন্য কোথাও রেখেছে কিনা। শেষে গেল মিষ্টি খালামণির রুমে। সেখানেও কিছু পেল না!

তাফিম ঘড়িতে দেখল, আর মাত্র সাত মিনিট আছে। না, কিছুই হলো না, ওরা ব্যর্থ। হঠাৎ করেই মিষ্টির গলা, 'কাচের বাক্সে কি আছে তা দেখতে চাইছো বুঝি, মানিকজোড়?'

মিষ্টিকে দেখেই ওরা চমকে উঠল। মিষ্টি বললেন, 'ভয় পাওয়ার কিছুই নেই। আয় আমি তোদের দেখাই ওগুলোতে কি আছে।'

তারপর তাবিনের ঘরে নিয়ে গেলেন। এদিকে বাড়ির সবার জ্ঞান ফিরেছে। মিষ্টি সবার আগে সবাইকে পানি পান করালেন। সবাই জানতে চাইলো- তাদের কী হয়েছে? মিষ্টি বলল, 'তেমন কিছুই না, বেশি গরম পড়ায় সবাই ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল। এখন লেবুপানি খেলেই সবাই আরাম পাবে।'

তাফিম-তাবিন অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছিল যে খালামণির কথা কখন শেষ হবে আর ওরা কাচের বাক্সে কী আছে তা দেখবে। শেষ পর্যন্ত তাফিম বলেই বসলো, 'খালামণি, তুমি তো ভুলেই গেলে! কাঁচের বাক্সে কী ছিল, দেখাবে না আমাদের?'

'অবশ্যই। মিসিলি, প্লিজ কাম হেয়ার উইথ দোজ গ্লাস বক্সেস।'

মিসিলি কাচের বাক্সগুলো নিয়ে এল। আর বলল, সিন্দুকের তালা খোলা, কিন্তু বাক্সগুলোর কিছু হয়নি!

মিষ্টি বললেন, 'এটা নিয়ে ভাবনার কিছু নেই। ঘরের লাইটগুলো নিভিয়ে দাও। দরজা-জানালা গুলো বন্ধ করে দাও।'

তার কথা মতো তাই করা হলো। কাচের বাক্সগুলো তখন তাবিনের পড়ার টেবিলের উপর। আলো নিভিয়ে দিতেই ওগুলো কেমন যেন জ্বলজ্বল করে উঠল। একটার ভেতরে লাল রঙের বড়ো মাথ াওয়ালা প্রাণীর প্রতিচ্ছবি। কিন্তু হাত-পা একদম ছোট্ট। অন্যটা নীল রঙের। সবাই জিজ্ঞেস করল, 'এগুলো কী?'

'রিফ্লেক্সন গ্লাস। এগুলো অন্ধকারে কোনোকিছুর প্রতিচ্ছবি তৈরি করে। কাছে গিয়ে একটু খেয়াল করে দেখো বক্সের ভেতরে আসলে কিছুই নেই। শুধু ভেতরে বিশেষ উপায়ে আঁকা ঐ প্রাণিগুলোর ছবি, যেগুলো অন্ধকারে তোমরা জ্বলজ্বল করতে দেখছো। আলোর সংস্পর্শে এলে এরকম দেখাবে মিষ্টি বললেন।

তৃণা জানতে চাইলেন, 'এটা কে বানিয়েছে?'

'আমার সিনিয়র। প্রফেসর সিসট্রিপ। ডিসেম্বরে আমরা বার্লিনে একটা মিথোলজি ফ্যাস্টিবল করব। তখন এই বাক্স দুটো প্রদর্শন করা হবে। শুধু আমরাই না, দেশ–বিদেশের অনেক মিথোলজিস্ট নানাভাবে তাদের গবেষণার বিষয়গুলো প্রদর্শন করবেন।

তাবিন বলল, 'খালামণি, বাক্সগুলো তো প্রফেসর নিজের কাছেই রাখতে পারতেন। তোমাকে দিলেন কেন?'

'আসলে উনার ছেলে অসুস্থ। তাই তিনি নিজ শহর ছেড়ে গেছেন। যাবার আগে বাক্সগুলো আমার আর মিসিলির দায়িত্বে দিয়ে গেছেন। কারণ, তিনি বাক্সগুলো নিজ বাড়িতে রেখে যেতে স্বস্তি পাননি। আমরা তাঁর অনেকদিনের বিশ্বস্ত সহচরী। আমার কাছে মনে হয়েছে ওগুলোকে রাখার সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা হচ্ছে ভেতরে ফোম দেয়া মিসিলির ঐ সিন্দুকটা। সে ওটাতে কাচের থালাবাসন রাখতো।'

তাফিম এবার ফিক করে হেসে দিলো। সে তাবিনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এই তাহলে আমাদের লাল গোম্বা আর নীল গোম্বা?' ■

গল্প

ভূতের সাথে একরাত

আশরাফ আলী চারু

সিয়ামদের বাড়ির চারপাশে পানি আর পানিতে টইটম্বুর। ইরি ধানের ফসল কাটার পর ক্ষেতগুলোতে কোন ফসল নেই। তাই খালি ক্ষেতে এ পানি যেন মসৃণ আয়নার মতো ঝিকমিক

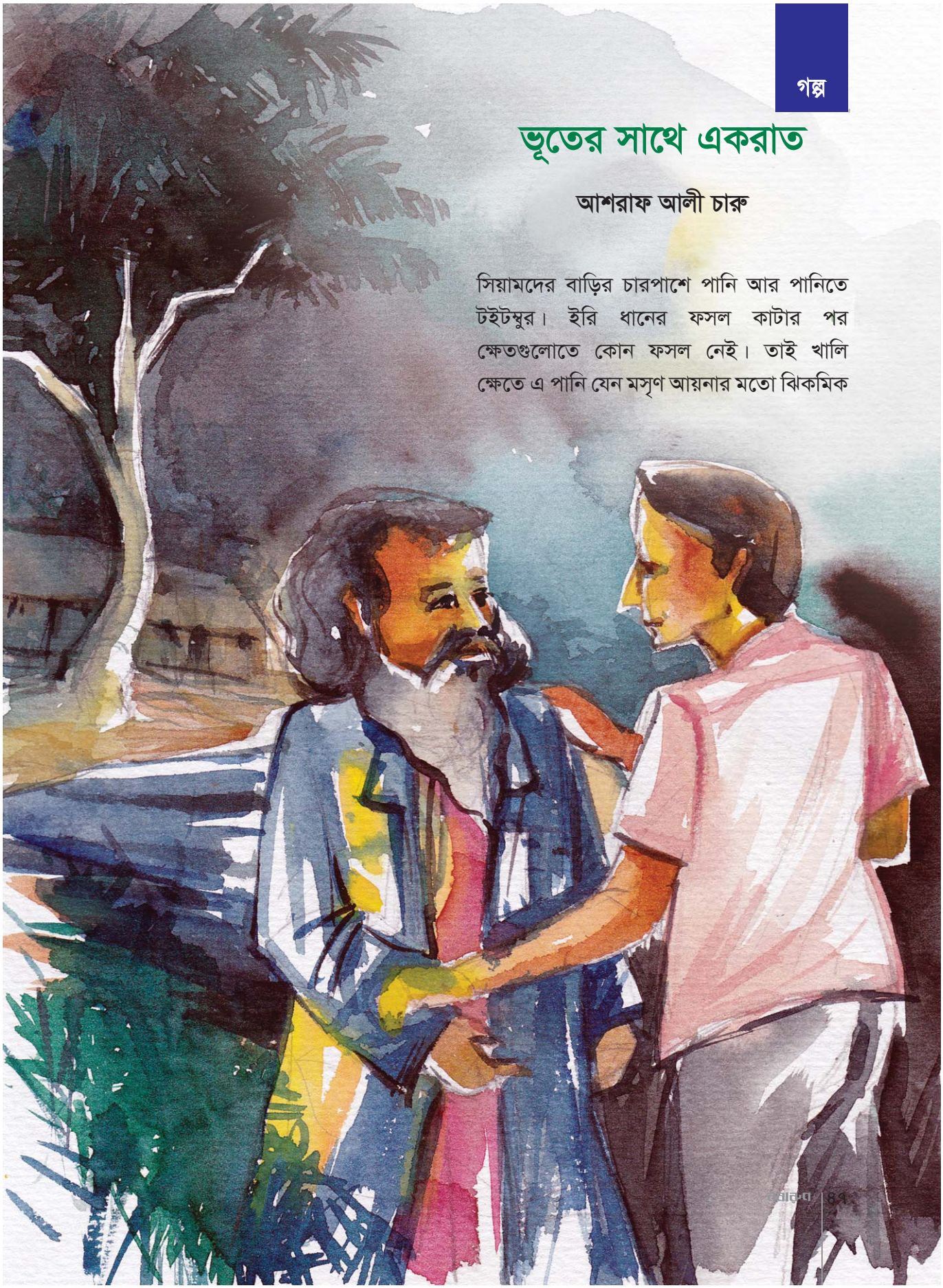

করছে। দিনে সূর্যের তীর্যক আলো আর রাতে চাঁদের কিরণ এ পানিতে মিশে এক নতুন অনুভূতি তৈরি করে সকলের মনে। বাড়ির আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকালে এক মনোমুগ্ধকর দৃশ্য উপভোগ করা যায়। সিয়াম সে মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখার লোভ সামলাতে পারেনা। এ দৃশ্য তার কাছে খুব প্রিয়। তার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে চাঁদের স্নিগ্ধ আলোয় ঝিকঝিকে পানির ঢেউ। তাই সে চাঁদনী রাতে বাড়ির আঙ্গিনায় মাচাতে বসে সে দৃশ্য নিয়মিত উপভোগ করে। চাঁদের কিরণ আর পানির মিতালীর মুগ্ধতায় নিজেকে ডুবিয়ে রাখে। বাড়ির সবাই যখন ঘুমে মগ্ন তখন সে চাঁদের স্নিগ্ধ আলো এবং পানির ঢেউয়ের সাথে হৃদয় মিলিয়ে হারিয়ে যায় অন্য এক রাজ্যে। অসম্ভব ভালো লাগা এক রাজ্যে। আজও চাঁদের স্নিগ্ধ আলোয় এ দৃশ্য সে উপভোগ করছিল। সে ডুবে গিয়েছিল এক অচিন ভাবনাপুরীতে। হঠাৎ তার ভাবনায় ভাঙন ধরে এক বৃদ্ধের গোঙ্গানি আওয়াজ শুনে।

সে আশেপাশে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করে কে এমন আওয়াজ করে? পূর্বপাশের ক্ষেতটার আইলের উপর বসে থাকা এক বুড়ো মানুষের উপর চোখ পড়ে তার। সে লোকটাই কেমন যেন গোঙ্গানি আওয়াজ করছে। অতিশয় বৃদ্ধ এ লোকটা কাতর স্বরে হাঁপাচ্ছে। লোকটির মাথায় সাদা ঝাঁকড়া বাবরি, মুখ ভরা লম্বা সাদা দাড়ি। গায়ে তার লম্বা জোব্বা।

লোকটার বেশভূষা দেখে খুব ধার্মিক বলে মনে হলো সিয়ামের। তবে তার হাঁপানো দেখে খুব মায়া হলো ওর। ভালোলাগা জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ আলো আর বাতাসে পানির ঢেউ খেলানোকে উপেক্ষা করে সে বৃদ্ধের কাছে গেল। কাঁধে হাত রেখে বলল– দাদু, তুমি কোত্থেকে এলে?

সিয়ামের হাতের স্পর্শ পেয়ে বৃদ্ধ একটু নড়ে চড়ে উঠল, কাঁপা কণ্ঠে বলতে লাগল– আর বলিস না ভাই, বহুদিন যাবত মাছ খাইনা, তাই ভাবলাম দুএকটা মাছ ধরি।

-তা পেলে দাদু?

-পেলাম আর কোথায়! ঐ যে দেখ শেয়ালটা আমার আগে আগে সব খেয়ে যাচ্ছে। আমি বৃদ্ধ বলে ওটা আমাকে তোয়াক্কাই করছে না।

সিয়াম তাকিয়ে দেখল লোকটি মিথ্যে বলে নি সত্যিই এক বুড়ো শেয়াল আগে আগে চলছে- মাছ ধরছে আর গপাগপ করে গিলছে। সিয়াম কিছু বলতে যাবে এমন সময় বৃদ্ধ বলে উঠল আমাকে দাদা বলে ডাকলিই যখন একটা উপকার কর না ভাই।

-কী উপকার দাদা?

-আমি বাড়ি ফিরে যাব। একটু আগবাড়িয়ে দিবি?

-আমিতো তোমার বাড়ি চিনি না দাদা?

-আমি তো চিনি। তুই শুধু হাত বাড়িয়ে আমাকে এগিয়ে নিয়ে যা।

বৃদ্ধের এমন কাতর কণ্ঠের আব্দার ফেলতে পারল না সিয়াম। লোকটাকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল সে। আর এ কাজে সাহায্য করতে গিয়ে সিয়াম অনুভব করল লোকটার গা অসম্ভব রকম ঠান্ডা। মানুষের শরীর এতটা ঠান্ডা হতে পারে এমনটা কল্পনাও করা যায় না। সিয়ামের মনে সন্দেহের দানা বাঁধলো। তার মনে পড়ে গেল বাবার কাছে একবার গল্প শুনেছিল ভূতেদের শরীর নাকি খুব ঠান্ডা হয়। সুতরাং এ ভূত ছাড়া আর কিছু নয়। তবু সে কোনোকিছু না বলে বৃদ্ধের কথামত

এগিয়ে যেতে থাকল। বৃদ্ধ সত্যিই শারীরিকভাবে দুর্বল। হাঁটতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে তার। সিয়াম মনে মনে ভয় পেলেও হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বৃদ্ধকে। এভাবে চলতে চলতে একসময় বৃদ্ধের বাড়িতে পৌঁছে গেল।

বাড়ির দরজা বন্ধ দেখে বৃদ্ধ বউকে চিৎকার আর চেঁচামেচি করে ডাকতে লাগল। স্বামীর বাড়ি ফেরার আওয়াজ বুঝে সে দরজা খুলেই চোখ কপালে তুলে স্বামীর প্রশংসা করতে লাগল। বলতে লাগল হ্যাঁ গো, তোমার তো দেখি এখনো বুদ্ধি হয়নি! কতবড়ো একটা মানুষের ছাও ধরে এনেছো। কীভাবে এ কাজ করলে গো? ভালোই হয়েছে কতদিন ধরে মানুষের মাংস খাওয়া হয় না। এবার ভাজা-ভুনা করে খাওয়া যাবে কয়দিন।

আনছো এবার নরের ছানা,
ভাজাভুনায় মজার খানা।
নরের ছানা ভারী মজা,
আঙুল কেটে গড়বো গজা!

এই বলে ভূতের বউ নাচতে আরম্ভ করল। চেঁচামেচি করতে লাগল।

এতক্ষণে সিয়াম বিষয়টা পুরোপুরিই বুঝতে পারল। সে মানুষরূপী ভূতের খপ্পরে পড়েছে। প্রথম হতেই তার এরকম একটা ধারণা হয়েছিল। এবার এই ধারণা পরিপুর্ণ বিশ্বাসে পরিণত হলো। সে ভাবতে লাগল ভূতের রাজ্যে এসে কেউ কোনোদিন ফিরে যায় নি। সুতরাং তারও আর ফিরে যাওয়া হবে না। এই বলে সে নিজেকে মনে মনে ধিক্কার দিতে লাগল। কেন যে উপকার করতে গেল, সেটাও তার মনকে পীড়া দিতে লাগল। মনে মনে সে ভয়ে কাচুমাচু হতে থাকল।

এবার বৃদ্ধভূত বউকে চড়া মেজাজে ধমক দিয়ে বলে উঠল– তুই থাম? ও আমাকে দাদা বলে ডেকেছে, আমাকে বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে এসেছে। ধরে ধরে আমাকে না নিয়ে এলে বাড়ি পর্যন্ত আসাই হতো না আমার।

ধরতে গিয়ে মাছ-
দৈত্যের পেলাম আঁচ!
শেয়াল সেজে দৈত্য বেটা
সামনে দেখায় নাচ!
এমন সময় নাতি আমার
কাছে এসে বলে,
পাইছো নি মাছ দাদু?
নয়তো যেতাম চলে।

আর এমন নাতিটাকে তুমি যাতা বলে ভয় দেখাচ্ছো? তার কোনো ক্ষতি হোক এটা আমি চাই না। আর আমার বাড়িতে কখনই হবে না। ওর জন্য ভালো খাবার আয়োজন কর , ও খাবে তারপর ওকে রথে করে বাড়ি পৌঁছে দেব আমি।

এবার বৃদ্ধ ভূত সিয়ামের কাঁধে হাত রেখে অভয় দিয়ে বলে, আমি বেঁচে থাকতে তোর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না কেউ। আমরা ভূত হলেও তোর উপকারের প্রতিদানে অপকার করব না ভাই। তুই নিশ্চিন্তে দাদার বাড়িতে খাবিদাবি, ঘুমাবি কোনো সমস্যা নেই।

স্বামীর এমন কথা শুনে ভূতের বউয়ের মনেও সিয়ামের উপর প্রশান্তির ছায়া নেমে এল। দৈত্যরা ভূত ধরে খায়। আজ তার স্বামীকেও ছাড়তো না যদি সময় মত এ ছেলে না আসতো। সুতরাং এ ছেলে যে উপকার করেছে তার পাওনা মিটানো দরকার। কিন্তু কীভাবে? ভূতনীর মনে ভাবনা এল, রান্না করে ছেলেটাকে পরিতৃপ্তিসহ খাওয়াতে পারলে মনে শান্তি পাবে। এই ভেবে

সে স্বামীর সাথে সিয়ামকে বসিয়ে গল্প করতে দিয়ে সে রান্নার কাজে মনোযোগ দিলো।

এরপর সারারাত ধরে রান্না হলো। সে কত রকমের রান্না; বলে শেষ করা যাবে না। সিয়াম এতগুলো খাবারের নামই যে জানে না! কীভাবে জানবে? ভূতের বাড়ির রান্না বলে কথা!

ভূতের বাড়িতে কে খাবার খেতে চায়? সিয়ামও খেতে চাইলো না। কিন্তু বৃদ্ধ ভূত দাদা এমন ভাবে বললেন, খাবার ইচ্ছে না থাকলেও সিয়াম খেতে বাধ্য হলো। খাবার খেতে খেতে অনেক গল্প শুনা হলো দাদার কাছে।

খাওয়ার পর্ব যখন শেষ হলো ততক্ষণে ফজরের আযান হচ্ছে। মা পাশে এসে ডাক দিলেন কিরে সারারাত ধরে এখানেই পড়ে থাকবি?

সিয়াম জেগে উঠে চারপাশ দেখছে। ভয়ে ওর শরীর কাঁপছে। মাকে সব বলতে গিয়েও থেমে গেল। যদি সেই বৃদ্ধ ভূত নিরাকার হয়ে পাশে বসে সব শুনে ফেলে!

সে নিজেকে কিছুটা সংযত করে মাকে বলল, তুমি যাও মা, আমি আসছি। মা চলে গেল। সে চারদিকে আরেকবার তাকিয়ে দেখে নিল সব ঠিক ঠাক আছে কিনা? দেখতে পেল সব ঠিকঠাক আছে শুধু ভূতের সাথে যে রাতটি কেটে গেল সে রাতটি শেষ হয়ে চারদিকে আলো ফুটে ওঠেছে! ■

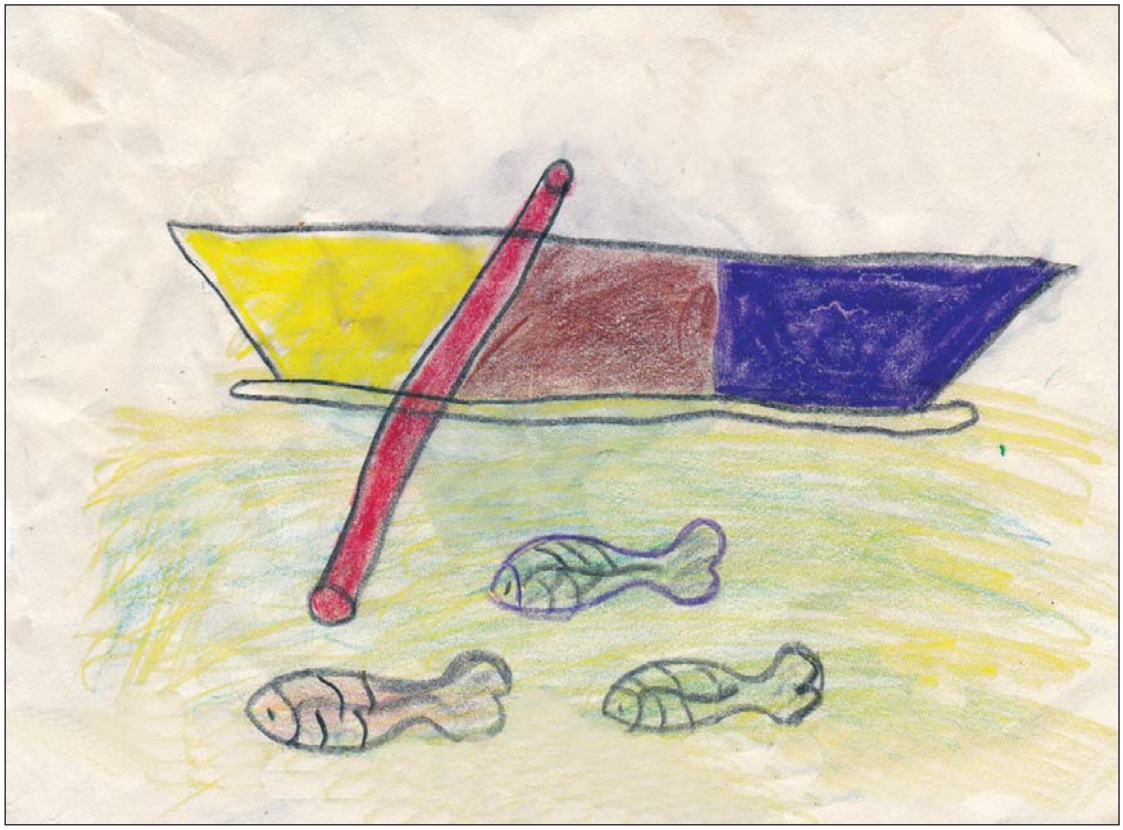

মোছা. জীম, প্রথম শ্রেণি, পাইক গাছা সরকারি প্রাথমিক দিব্যালয়, খুলনা।

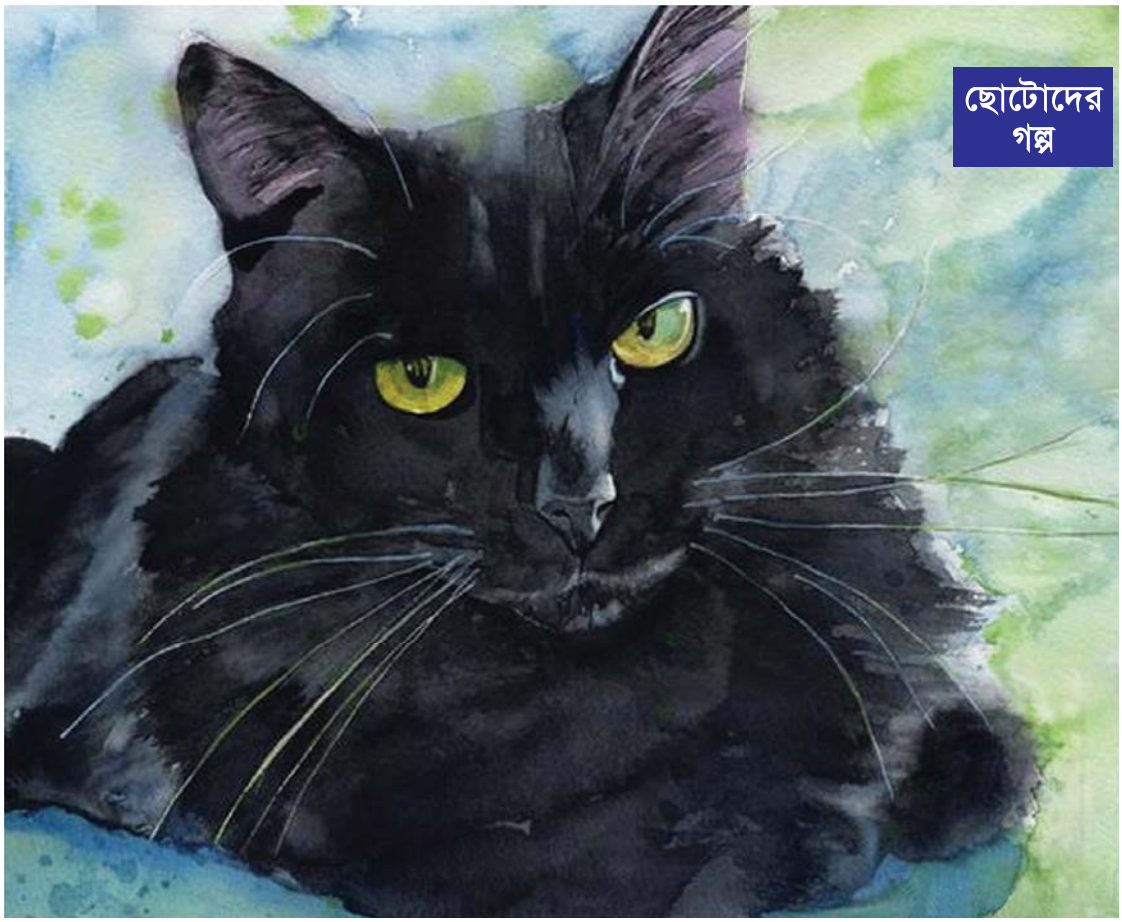

ওর নাম টাইগার

ওয়াহিদ মুস্তাফা

ওর নাম টাইগার। না না, আসল টাইগার না। সে একটি বিড়াল। আমার পোষা বিড়াল। সেই টাইগারটা না– একদিন একটি ইঁদুর ধরল। কিন্তু ইঁদুরটাকে সে মারেনি, খায়ওনি। শুধু খেলছে ওর সাথে।

টাইগার আমার কাছে এসে বলল, এ হচ্ছে আমার বন্ধু র‍্যাট।

আমি তো ইঁদুর দেখে ভয়ে অস্থির। তখন ইঁদুরটাকে টাইগার বলল, যাও বন্ধু, মা'র কাছে যাও। ইঁদুরটা লাফাতে লাফাতে চলে গেল ধানের গোলার দিকে। ওরা সেখানেই থাকে। সেখানে নাকি তার একটা ছোটো বোনও আছে।

আমি টাইগারের ওপর খুব খুশি হলাম, ইঁদুরকে বন্ধু বানিয়েছে বলে। খুশি হয়ে বললাম, তোকে আজ নিজের হাত দিয়ে খাওয়াব টাইগার। তা শুনে টাইগার অনেক খুশি হলো।

টাইগার সব সময় আমার সাথে সাথে ঘোরে। যেখানে আমি যাব, সেও সেখানে যাবে আমার সাথে সাথে।

একদিন আমরা বাড়ির সামনে খেলছিলাম। টাইগার সেখানে এসে আমাদের সাথে খেলতে চাইল।

আমি, তালিম, আবির, সাবিত, নিশান, জুনাইদ,

মাহবুবা আক্তার তিশা, ষষ্ঠ শ্রেণি, সানরাইজ কিন্ডারগার্টেন স্কুল, কুমিল্লা।

মাসাব, মেশকাত সবাই ওর দিকে তাকালাম। জুনাইদ বলল, তুমি তো অনেক ছোটো বাবু। তুমি কী খেলতে পারবা? তখন টাইগার মুখ কালো করে চলে গেল। আমি জুনাইদকে বললাম, ছিঃ জুনাইদ, ছোটোদের সাথে এভাবে কথা বলতে হয় না। জানো, ও ইঁদুর ধরে খায় না, শুধু খেলে তার সাথে। ও কত ভালো।

তখন জুনাইদ খুব লজ্জা পেল। বলল, ওয়াহিদ ভাই, আর অমন কথা বলব না।

পরের দিন আবার টাইগার এল। দূরে দাঁড়িয়ে আমাদের খেলা দেখছে। কিছু বলছে না। মুখ কালো। তখন জুনাইদ, নিশান, মেশকাত ওরা ছুটে যায় টাইগারের কাছে। বলে, টাইগার, এসো তুমিও খেলবে আমাদের সাথে। দেখাও তো, কি খেলা জানো তুমি।

তখন টাইগার খুব খুশি হলো। তারপর উপর দিকে তিড়িং করে দিলো এক লাফ। অনেক উপরে উঠল, আবার নিচে পড়ল। কয়েকবার ডিগবাজি দিলো।

তখন আমরা সবাই হেসে কুটিকুটি। তারপর বললাম, টাইগার, তুমি পরীক্ষায় পাস। এখন এসো, আমরা সবাই একসাথে খেলি।

তারপর আমরা সবাই খেলায় মেতে উঠলাম। ■

নার্সারি শ্রেণি, শিশুকলি নার্সারি স্কুল, বাগাড়পাড়া, যশোর

বৈশাখি মেলার রহস্য

যাহিন যাওয়াদ

পলাশের বৈশাখি মেলায় যেতে খুব ভালো লাগে। কোনো কিছু কিনুক না কিনুক প্রত্যেক দিন সে মেলায় যাবেই। একবার তাদের গ্রামে বৈশাখি মেলা বসেছে। মেলা থাকবে দশ দিন। পলাশের বাসা থেকে মেলা বেশি দূরে নয়। বিশ মিনিটের রাস্তা।

মেলার প্রথম দিন ১৪ই এপ্রিল। সকালে পান্তাভাত খেয়ে পলাশের আর তর সইছে না। সোজা চলে গেল মেলাতে। মেলার সব দেখা শেষ করে এক কোনায় দেখল, একজন বৃদ্ধ লোক কিছু মাটির পুতুল নিয়ে বসে আছে। সব দোকানে মানুষের ভিড়। কিন্তু ওখানে কোনো মানুষই নেই। মেলার ওই দিকটা কেমন নির্জন। বেশি চিন্তা না করে পলাশ কাছে গিয়ে একটা পুতুল হাতে নিল। পুতুলগুলো মানুষের মতো না। কেমন যেন ভূতের মতো। কিন্তু খুব আকর্ষণীয়। পলাশ বলল, 'এগুলোর দাম কত?'

বৃদ্ধ লোকটি কোনো কথা বলল না। পলাশ আবারও বলল, 'কত দাম?'

এবারও কোনো উত্তর এল না। পলাশ বলল, 'বিশ টাকা দিলে হবে?'

বৃদ্ধ লোকটি উত্তর না দিয়ে শুধু মাথা ঝাঁকাল। পলাশ বিশ টাকা দিয়ে একটা পুতুল কিনে নিল। তারপর বাড়িতে চলে এল। সারাদিন মেলায় হেঁটে পলাশ ক্লান্ত। রাতের খাবার খেয়েই ঘুমে তার চোখ বন্ধ হয়ে গেল।

পরদিন সকাল। পলাশ আবার ছুটে গেল মেলাতে। আজ দ্বিতীয় দিন। তবুও মেলার ভিড় কমেনি। সারা মেলা ঘুরে পলাশের খুব ইচ্ছা হলো সেই জায়গায় যেতে। যেখানে বৃদ্ধ লোকটি পুতুল বিক্রি করছিল। গিয়ে দেখে আজ সেই বৃদ্ধ

লোকটি বসেনি। তখন সে পাশের দোকানদারকে বলে, 'গতকাল এখানে যে লোকটা বসেছিল, আজ সে কি আর বসেনি?'

পাশের দোকানদার বলল, 'কই, কাল তো এখানে কেউ বসেনি।'

পলাশ বলে, 'সে কি! আমি যে উনার কাছ থেকে পুতুল কিনলাম।'

লোকটি বলল, 'না, না, এখানে কেউ পুতুল নিয়ে বসেনি।'

পলাশের একটু সন্দেহ হয়। কোনো কিছু কি ভুল হচ্ছে? ভাবতে ভাবতে সে বাড়ির দিকে রওনা দেয়।

বাড়ির পথে তার দেখা হলো শামুদ চাচার সাথে। শামুদ চাচাও পলাশের মতো ছোটোবেলা থেকে মেলায় নিয়মিত আসেন। পলাশ তার চিন্তার ব্যাপারটি শামুদ চাচাকে বলে। শামুদ চাচা বলেন, 'অনেক আগে এক বৃদ্ধ প্রতি বছর মেলাতে আসত পুতুল বেচতে। হঠাৎ একদিন এল কালবৈশাখি ঝড়। কয়েক মিনিটের মধ্যে মেঘ কালো হয়ে চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেল। সবাই দ্রুত মেলা থেকে পালাতে লাগল। কিন্তু পুতুলগুলো নিয়ে মেলা থেকে বের হতে বৃদ্ধ লোকটির একটু দেরি হয়ে যায়। আচমকা এক বজ্রপাতে তার মৃত্যু হয়। এরপর থেকে অনেকেই তাকে মেলায় পুতুল বেচতে দেখে।'

পলাশ শুনছে, আর মনে মনে ভাবছে, সত্যিই কি গতকাল সে পুতুল কিনেছে? ■

অষ্টম শ্রেণি, রূপনগর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা।

সাকিব, বয়স ১৪ বছর, ঢাকা।

হারিয়ে যাওয়া লোকজ ঐতিহ্য

মেজবাউল হক

বাংলাদেশের ঐতিহ্যের শেকড় হলো গ্রাম। গ্রামীণ জীবণপ্রণালী, শস্য উৎপাদন, যানবাহন, যন্ত্রপাতি, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যদ্রব্য, চিত্তবিনোদন ইত্যাদির সরল, প্রাণবন্ত ও প্রাকৃতিক রূপ আমাদের লোকজ ঐতিহ্যের মৌলিক বৈশিষ্ট্য।

তবে সময়ের পরিক্রমায় বাংলাদেশ বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যবসায়, কর্ম পরিসর, পোশাক-পরিচ্ছদ, আহার, উৎসব ও যাতায়াতের মাধ্যমগুলোর দিক থেকে হয়ে উঠছে আরো আধুনিক ও উন্নত। এই বিচিত্র, গতিশীল ও চকচকে নগরায়নের প্রভাবে কালের গর্ভে হারিয়ে যাচ্ছে বাংলার প্রাচীন লোক ঐতিহ্য। সেসব হারিয়ে যাওয়া রত্ন নিয়েই এবারের আয়োজন।

বায়োস্কোপ

দেশের প্রতিটি অঞ্চলে বায়োস্কোপের ব্যাপক প্রচলন ও জনপ্রিয়তা ছিল। বাংলা সাহিত্যে আমরা বায়োস্কোপের উপস্থিতি দেখতে পাই। যারা বায়োস্কোপ দেখাতেন ছোটো-বড়ো সবার কাছে তাদের কদর ছিল। দেশের কোথাও কোথাও এখনো বায়োস্কোপ দেখতে পাওয়া গেলেও এর সংখ্যা খুবই কম।

বাঁশের কঞ্চির কলম

খুব বেশিদিন আগের কথা নয়। আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা (৪০-৫০ বছর পূর্বে) বাঁশের তৈরি কলম দিয়ে লেখা শেখার হাতেখড়ি নিয়েছে। বাঁশের কঞ্চিকে ৪-৫ ইঞ্চি পরিমাণ কেটে নিয়ে তার এক প্রান্ত চোখা করে তাতে কালি মিশিয়ে কলম হিসেবে ব্যবহার করা হতো। এটিও এখন বিলুপ্ত।

কলাপাতা ও তালপাতার কাগজ

একসময় কলাপাতা ও তালপাতাকে কাগজের বিকল্প হিসেবে লেখার কাজে ব্যবহার করা হতো। বিশেষ করে প্রাথমিক স্কুলের শিশুদের লেখা শেখাতে ও হাতের লেখা সুন্দর করতে কলাপাতা ও তালপাতা ব্যবহার করা হতো।

ডুলি

বাঁশ ও পাটের দড়ি দিয়ে নির্মিত একপ্রকার ঝুলন্ত আরামদায়ক পরিবহণ ছিল ডুলি। ডুলি দু'জন বেহারা কাঁধে বহন করত। গ্রামের নববধূরা বাবার বাড়ি নাইয়র যেত বা বাবার বাড়ি হতে স্বামীর বাড়ি যেত ডুলিতে চড়ে। বিয়ের দিন কনের সহযাত্রী হয়ে কনের নানি বা দাদি ডুলিতে চড়ে বরের বাড়ি আসত।

মাথাল

মাথাল গ্রামীণ কৃষকদের একটি অতি প্রয়োজনীয় জিনিস ছিল। বাঁশ ও শালপাতার সাহায্যে এটি তৈরি

করা হতো। জমিতে কৃষিকাজ করার সময় রোদ-বৃষ্টি হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য গ্রামীণ কৃষকদের কাছে এটি ছিল অতি প্রয়োজনীয় উপকরণ। অনেকে এটি তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করত। আজকাল মাথালের প্রচলনও গ্রামে-গঞ্জে খুব একটা দেখা যায় না।

জাঁতা

আমরা বাংলা চলচ্চিত্রে, সাহিত্যে, গল্প-উপন্যাসে জাঁতাকে যেমন দেখতে পাই তেমনি বাস্তবেও গ্রামবাংলার বাড়িতে বাড়িতে এক সময় এই জাঁতার প্রচলন ছিল। শারীরিকভাবে যারা শক্ত-সামর্থ্য ছিল তারা অতি দক্ষতার সঙ্গে জাঁতা ব্যবহার করতেন।

খেজুরপাতার পাটি

গ্রামবাংলার প্রতিটি বাড়ি-ঘরে গৃহস্থালি বিভিন্ন কাজে খেজুরপাতার পাটি ব্যবহার করা হতো। কিন্তু বর্তমানে আধুনিকতার ছোঁয়ায় তা আর দেখা যায় না। এটি ছিল গ্রামীণ ঐতিহ্যের আর একটি অংশ। গ্রামের নারীরা বিশেষ উপায়ে খেজুরপাতা দিয়ে তৈরি করতো 'শীতলপাটি'।

গোলা

এক সময় ধান রাখার একমাত্র মাধ্যম ছিল গোলা। বাংলাদেশের গ্রামবাংলা কৃষির ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল থাকার কারণে গোলার কোনো বিকল্প ছিল না। এই গোলাকে এমনভাবে তৈরি করা হতো যেন ইদুর ঢুকতে না পারে। এখন কিন্তু গ্রামবাংলার গৃহবধূরা ধান অথবা চাল গোলায় নয়, রাখছেন ড্রামে।

দোয়াত-কালি

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামসহ বাংলা সাহিত্যের কবি-সাহিত্যিকরা তাঁদের সৃষ্টিশীল সাহিত্যকর্ম দোয়াত-কালির সাহায্যেই করেছেন। কিন্তু বিভিন্ন প্রকারের কলম আবিষ্কারের পর দোয়াত-কালি ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নিয়েছে। প্রাচীন যুগের গল্প-উপন্যাসে আমরা দোয়াত-কালির উপস্থিতি দেখতে পেলেও বাস্তবে এর প্রচলন আর নেই।

পালকি

বাংলাদেশের উৎসবের একটি বড় অংশ বিয়ে। গ্রামের বাড়িতে নববধূ তুলে আনার জন্য পালকি ব্যবহার করা হতো। সারা দেশে একসময় এই পালকির ব্যাপক প্রচলন ছিল। পালকির জায়গায় আজ প্রাইভেটকার ও মাইক্রোবাস দখল করে নিয়েছে। বাংলার ঐতিহ্য পালকি আজ জাদুঘরে।

ঢেঁকি

ধান ও চাল ভাঙানোর জন্য ঢেঁকির ব্যবহার বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চলেই ছিল। পরবর্তীতে চাল ও ধান ভাঙানোর কল তৈরি হওয়ায় ঢেঁকির প্রচলন কমে যায়। গ্রামের বাড়িতে বাড়িতে এখন আর ঢেঁকি দেখা যায় না। বাস্তবে দেখতে না পেলেও ঢেঁকি আমাদের এই বাংলার একটি অংশ।

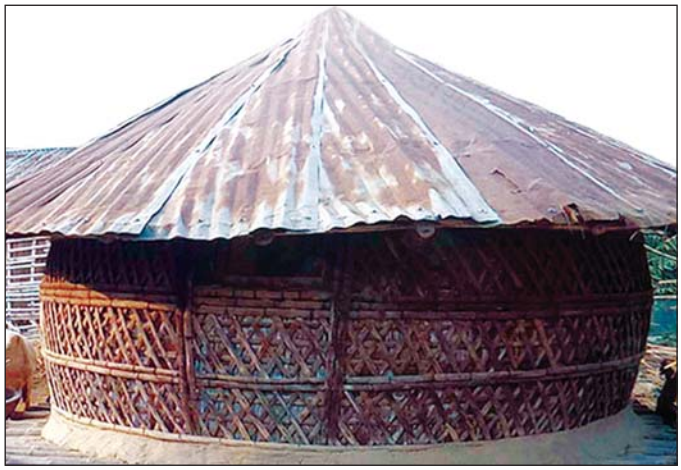

এভাবেই এক সময়ের অতি প্রয়োজনীয় জিনিস কালের পরিক্রমায় আমাদের কাছ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। স্মৃতি হয়ে আছে সবার মাঝে। ■

বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস

তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি দিবস যা সারা বিশ্বব্যাপী ২রা এপ্রিল পালন করা হয়। এই দিনটিতে জাতিসংঘ বিশ্বজুড়ে তার সদস্য দেশগুলোকে অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার আক্রান্ত ব্যাক্তিদের সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য নানা কর্মসূচি গ্রহণে উৎসাহিত করে। 'বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস' প্রস্তাবটি ২০০৭ সালের ১লা নভেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে পাস হয়েছিল এবং সেটি গৃহীত হয়েছিল একই বছরের ১৮ই ডিসেম্বর তারিখে। এই প্রস্তাবটি জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে বিনা ভোটে পাস এবং গৃহীত হয়।

এরপর থেকে প্রতিবছর বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা অনুষ্ঠান আয়োজনের মধ্য দিয়ে ২রা এপ্রিলকে বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস হিসেবে পালন করে আসছে।

জাতিসংঘের এবারের 'বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস'- এর মূল বিষয়টি ছিল The Transition to adulthood: অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্কে রুপান্তর। মানে অটিজমে ভোগা একজন মানুষ কৈশোর পার করে প্রাপ্তবয়স্কে পরিণত হবার পথটাকে সুগম করা। সময়ের সাথে সাথে শিশুর মানসিক বিকাশ হোক বা না হোক তার বয়স বাড়তেই থাকবে। শারীরিক গঠনেরও অনেক পরিবর্তন ঘটে। শিশু থেকে সাবালকে প্রবেশের কারণে তার উপর আয় উপার্জনের বিষয়টিও চলে আসবে। এ বিষয়টির উপর আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে।

কিন্তু ছোটোবেলা থেকে শিশু যথাযথভাবে বিকশিত না হলে সাবালক হওয়ার সময়ে অনেক সমস্যা দেখা দেয়। অভিভাবককে পোহাতে হয় অনেক যন্ত্রণা। শারীরিক গঠনের কারণে ছেলে শিশুর গায়ের শক্তি বেড়ে যায়। যে কারণে অনেক অস্বাভাবিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। আবার একই সাথে মেয়ে শিশুর মানসিক বিকাশের উন্নতি না হলে তাকে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

তাই বিকাশজনিত বয়স ও কালানুক্রমিক বয়সের মধ্যে একটি সুষ্ঠু সমন্বয় থাকা জরুরি। একারণেই অটিজমে আক্রান্ত একজন শিশুকে যথাসম্ভব লেখাপড়া শিখিয়ে, তার দক্ষতা উন্নয়ন করতে হবে। চেষ্টা করতে হবে তার উপযোগী চাকরি দেওয়ার মাধ্যমে তাকে আয় করতে দেয়ার এবং স্বাধীনভাবে চলতে পারার ক্ষমতাটুকু তৈরি করে দেওয়া। প্রাথমিক পর্যায়ে যথাযথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অটিজমের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশুদের অবস্থার উন্নতি ঘটানো সম্ভব। এই শিশুরা পৃথিবীকে আমাদের থেকে আলাদা ভাবে দেখে। এরা খুব ভালো পর্যবেক্ষক। আশপাশের অনেক কিছুই তারা পর্যবেক্ষণ করে। ভালো আচরণ, ভালোবাসা ও সহমর্মিতার মাধ্যমে তাদের সমাজের মূল ধারায় নিয়ে আসা সম্ভব। ■

নারীর ক্ষমতায়ন: কন্যাশিশুর সাফল্য

খুদে করোনা যোদ্ধা

জান্নাতে রোজী

নবারুণের বন্ধুরা, তোমাদেরকে আজ এমন একজনের কথা বলব যে করোনাকালীন এ সময়ে বাসায় অবরুদ্ধ থেকেও চুপ করে বসে থাকেনি। নিজের যেটুকু সামর্থ্য আছে সেটুকু দিয়েই শামিল হয়েছে করোনা যুদ্ধে। পাশে সমর্থক ও সাহায্যকারী হিসেবে পেয়েছে বাবাকে।

সুত্রা চাকমা। দশম শ্রেণির ছাত্রী। পড়ে রাজধানীর দিয়াবাড়ির মাইলস্টোন কলেজে। বাবা কলেজের শিক্ষক। বাবা-মেয়ে দুজনই চাইছিল এই অবরুদ্ধ সময়ে অসহায় মানুষদের সাহায্য করতে। কিন্তু কীভাবে? উপায় বের করল সুত্রা নিজেই।

ছবি আঁকার হাত বেশ ভালো সুত্রার। বিশেষ করে পোর্ট্রেট। যদিও প্রাতিষ্ঠানিক কোনো শিক্ষা নেই। তবে ছবি এঁকে ফেসবুকে বেশ পরিচিতিও পেয়ে গেছে। একটি গ্রুপও হয়ে গেছে ওর। সুত্রা ঠিক করল, ছবি বিক্রি করবে সে। সেখান থেকে যা আয় হবে তা দিয়েই সাহায্য করবে করোনাকালে দুর্ভোগে থাকা দারিদ্র্যপীড়িত মানুষদের। যে কথা সেই কাজ। ফেসবুকে সুত্রা জানিয়ে দিল, কেউ চাইলেই তার ছবি এঁকে দেবে সে। খুশি হয়ে যে যা দেবে।

আগ্রহীদের পাঠানো আলোকচিত্র থেকে পোর্ট্রেট এঁকে দিয়েছে সুত্রা। ছবিগুলো এঁকে মোবাইলে ছবি তুলে মেসেঞ্জারে পাঠিয়ে দিচ্ছে। আর বিকাশের মাধ্যমে আগ্রহীরা টাকা পাঠাচ্ছেন।

গত ২৪ এপ্রিল সুত্রা ফেসবুকে তার ছবি আঁকার কথাটি জানানোর পর থেকে এ পর্যন্ত ২৫টি ছবি বিক্রি হয়েছে। উঠেছে ৩০ হাজার টাকা।

ছোট্ট এই মেয়েটি আমাদের এই শিক্ষাই দিচ্ছে, ইচ্ছে থাকলেই অনেক বড়ো কিছুও করা যায়। আমরা যারা এই করোনা যুদ্ধে এখনো শামিল হইনি,এসো বন্ধুরা আমরা যে যেখানে আছি, যার যেটুকু সামর্থ্য আছে সেটুকু নিয়েই অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াই। এই ছোট্ট মেয়ে সুত্রা হোক আমাদের প্রেরণা। ■

অসুস্থ পৃথিবীর সুস্থ শিশু

শাহানা আফরোজ

শিশুমন মানতে চায় না কোনো বাধা। সীমাবদ্ধতার দেয়ালে আটকে রাখা যায় না তাদের। নিজের মতো করে চলতে চায় ওরা। তবে বিশ্বজুড়ে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে আজ বিপর্যস্ত শিশু সহ সাবার জনজীবন। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো এ ভাইরাস থেকে বাঁচতে বাংলাদেশেও সবাই সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখছে। নিজ নিজ বাড়িতে হোম কোয়ারেন্টাইন বা সঙ্গ নিরোধে থাকার ফলে স্বেচ্ছা ঘরবন্দি হয়েছে মানুষ। শিশুরা স্কুলে যেতে পারছে না, ঘরের বাইরে বন্ধুদের সঙ্গে খেলতে বা বেড়াতেও যেতে পারছে না । তার উপরে করোনার আতঙ্ক শিশু মনে ভয় হয়ে বাড়ছে মানসিক চাপ। তারা যেন খাঁচায় বন্দী পাখি। বন্দী থাকার কারণে যেন কোনো ধরনের মানসিক চাপ সৃষ্টি না হয় সেদিকে পরিবারের বড়োদের সচেতন হতে হবে। পরিবারের বড়োরা সচেতন হলেই কোমলমতি এসব শিশুদের কাছে এই হোম কোয়ারেন্টাইন নামের বন্দী জীবন হয়ে উঠতে পারে স্বপ্নরাজ্য। শিশু ও মনোরোগ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, শিশুমনে করোনার বিষয়ে যেন আতঙ্ক ও ভয়ের সৃষ্টি না হয় এজন্য অভিভাবকদের যত্নশীল হতে হবে। ঘরের ভিতরেই শিশুদের হাসিখুশি রাখতে খেলাধুলা ও বিনোদনের আয়োজন করতে হবে।

মার্চ মাসে বাংলাদেশে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হলে জনসমাগম এড়াতে ১৮ই মার্চ থেকে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ করে সরকার। এর মধ্যে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করে বন্ধ করা হয় জনসমাগম, বিনোদন, পর্যটন, মার্কেটসহ সব কিছু। এতে শিশুদের মনোজগতেও পড়ছে বিরূপ প্রভাব। শিশুদের মনকে যেন করোনা ভয় ঘিরে ধরতে না পারে সে দিকটাই বেশি খেয়াল রাখতে হবে আমাদের। অন্যান্য সময় শিশুদের সঙ্গে সময়

কাটানোর জন্য আমরা অনেকেই তেমন একটা সুযোগ পাই না বন্দি এ সময়ে তাদের বাচ্চাদের সঙ্গে গল্প করতে হবে। তাদের কথা আগ্রহ নিয়ে শুনতে হবে । যে বিষয়গুলো শিশুরা পছন্দ করে যেমন তার স্কুল, বন্ধু বা যা পড়তে তার ভালো লাগে সেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। অযথা বাচ্চাকে বকাঝকা করা যাবে না। কারণ অতিরিক্ত বকাঝকা শিশুকে মানসিকভাবে দুর্বল করতে পারে অথবা তার দুষ্টমি বেড়ে যেতে পারে। এতে করে এই কঠিন সময় আরও দুর্বিসহ হয়ে উঠতে পারে। এ সময় আমরা যতটা পারি শিশুদের সঙ্গে ইনডোর গেইম খেলতে পারি। যেমন লুডু, দাবা, কেরাম ,বাগাডুলি অথবা আমরা ছেলেবেলায় খেলেছি এমন কিছু খেলা যা তাদের দিতে পারে অ্যাডভেন্চার সাথে হাশি খুশি কিছু সময়।

এসময় বিভিন্ন ডিভাইস থেকে যতটা সম্ভব দূরে রেখে বই পড়া, হাতের কাজে উৎসাহী করে তোলার চেষ্টা করতে হবে। এছাড়া বড়োদের কাজে সাহায্য করা, বাড়ির বয়স্কদের যত্ন নিতে যত্ন নিতে ঘর পরিষ্কার করা, গাছের পরিচর্যা করা ইত্যাদি কাজগুলো শিশুদের সাথে নিয়ে করতে হবে। যেন তারা একাকী অনুভব না করে। আবার কখনো তাদের মনের মতো করে সময় দিতে হবে।

সেচ্ছাবন্দী বা হোমকোয়ারেন্টাইনের এ সময় বন্ধু বা কাছের মানুষদের সাথে দেখা হওয়ার সুযোগ নেই তাই মাঝে মাঝে ডিভাইসের সাহায্য নিয়ে সবার সাথে সরাসরি কথা বলা যেতে পারে। কথা বলার সময়টুকু সকলের জন্য হতে পারে আনন্দময় মুহূর্ত ।

শিশুরা সবচেয়ে বেশি বড়দের অনুকরণ করে। এক্ষেত্রে আমাদের সচেতনতাই শিশুদের সচেতন করতে সাহায্য করবে। অপরিষ্কার হাতে চোখ মুখ নাকে হাত দিতে মানা করা, নিয়মিতভাবে কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড ধরে সাবান দিয়ে হাত ধোয়া, মাস্ক ব্যবহার করা, সুষম খাবার খাওয়া, সময়মতো বিশ্রাম নেওয়া এগুলো বার বার বলে শেখাতে হবে।

করোনা ভাইরাসে কারণে পরিবারের কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তা শিশুকে বুঝিয়ে বলতে হবে। কাউকে হাসপাতালে ভর্তি করার প্রয়োজন হলে শিশুকে তা আগে থেকে জানাতে হবে। তাকে বুঝাতে হবে আতঙ্কের কিছু নেই । ■

প্রাণ খুলে গান গাই

ফারুক হোসেন

ধন্য ওরা ধন্য
যে বীরেরা প্রাণটা দিল
এদেশেরই জন্য।
ওদের নিয়ে আমরা
প্রাণ খুলে গান গাই।

সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

গ্রামের জনসংখ্যা পাঁচজন!

একটি গ্রামের জনসংখ্যা মাত্র পাঁচজন। হ্যাঁ, বন্ধুরা শুনতে আজব হলেও সত্যি। এর মধ্যে রয়েছেন একজন পুরুষ, তিনজন নারী ও একটি শিশু। বাংলাদেশের সিলেটের বিশ্বনাথ উপজেলার খাজাঞ্চী ইউনিয়নে অবস্থিত গ্রামটির নাম 'শ্রীমুখ'। সরকারি গেজেটভুক্ত গ্রাম শ্রীমুখ। স্বাধীনতার আগে থেকেই বসবাস করে আসছেন এই একটিমাত্র পরিবার।

অপরাধবিহীন আদর্শ গ্রাম হুলহুলিয়া

নাটোরের শিংড়া উপজেলার হুলহুলিয়া গ্রাম। একটি আদর্শ গ্রামের প্রতিচ্ছবি। বাংলাদেশের ৬৮ হাজার গ্রামের মতোই হুলহুলিয়া একটি সাধারণ গ্রাম। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো এই গ্রামে দুশো বছরের ইতিহাসে কখনও পুলিশ প্রবেশ করেনি। কোনো মামলা আদালত পর্যন্ত যায়নি। ১৯৫৭ সালে গঠিত তাদের নিজস্ব সংবিধান রয়েছে। এ গ্রাম ১১ টি পাড়া নিয়ে গঠিত। অসাধারণ সভ্য একটি গ্রাম। ভাবতেই ভালো লাগে বাংলাদেশে এত সুন্দর গ্রামে এত ভালো কিছু মানুষ আছে তাই-না বন্ধুরা। এই গ্রামের শিক্ষিতের হার শতভাগ। রয়েছেন কৃষক, চাকরিজীবি এবং প্রবাসী।

মানুষ শূন্য গ্রাম

গ্রাম আছে মানুষ নেই! হঠাৎ এমন একটি কথা শুনতে আজব লাগছে তাই না। আসলেই এমন একটি মানুষ শূন্য গ্রাম রয়েছে। ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলার গ্রাম মঙ্গলপুর। উপজেলা শহর থেকে মাত্র ৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। সেখানে গিয়ে দেখা যায় কোনো ঘনবসতি নেই। জানা যায়, আজ থেকে দেড়শ বছর আগে গ্রামটিতে মানুষ বসবাস করতো। পরে কী কারণে গ্রামটি খালি হয়ে যায় সেটি অবশ্য জানা যায়নি।

এক মাসের গ্রাম

ভারতের গোয়ায় দারুণ একটি জায়গা আছে। মজার বিষয় হলো, প্রতিবছর মাত্র এক মাসের জন্য গ্রামটির দেখা পাওয়া যায়। অনেকটাই যেন জাদুর ব্যাপার। বাকি ১১ মাস এটি পানির নিচে ডুবে থাকে। গ্রামের নাম কুর্দি। এর বাসিন্দারা অন্যত্র স্থায়ীভাবে থাকেন। বছরের ১১ মাস পর পানি সরে গেলে এক মাসের জন্য পুরনো ঠিকানায় একত্রিত হন ঐ গ্রামের বাসিন্দারা। আনন্দ ও উৎসব করেন তারা। হারিয়ে যাওয়া ঘর বাড়ি ঘুরে ঘুরে দেখে স্মৃতি হাতড়ে বেড়ান।

বুদ্ধিতে ধার দাও

নাদিম মজিদ

শব্দধাঁধাঁ

পাশাপাশি: ১. যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী, ৪.ভিলনিয়ুস যে দেশের রাজধানী,৬.পৃথিবীর বৃহত্তম দেশ, ৭.বিশ্বের বৃহত্তম তামাক উৎপাদক ও রপ্তানিকারক দেশ, ৯.ইউরোপের একটি দেশ

উপর-নিচ: ১.নিউজিল্যান্ডের রাজধানী,২.নিশীথ সূর্যের দেশ হিসেবে পরিচিত,৩.ভূমধ্যসাগরের সর্ববৃহৎ দ্বীপ, ৫.কর্ডোবা যে দেশের মুদ্রার নাম, ৮.ত্রিপোলি যে দেশের রাজধানী, ৯. ইতালির রাজধানী

১					২		৩
	■	■	■	■		■	
৪		৫		■		■	
	■		■	■		■	■
	■	৬			■	৭	৮
	■		■	■	■	■	
■	■		■	৯			
■	■	■	■		■	■	■

ছক মিলাও

শব্দ ধাঁধাঁর মতই এক ধরনের ধাঁধাঁ ছক মিলাও। ছকে যেসব শব্দ বসিয়ে মেলাতে হবে, তা নিচে সংকেতের পাশে দেয়া হলো। বোঝার সুবিধার্থে একটি ঘর পূরণ করে দেয়া হলো।

সংকেত:খাগড়াছড়ি, লকডাউন, প্রথম, ছবি, সকল, আখড়া, উপহার, মহাসাগর, মা, গজ, প্রসার, রথ

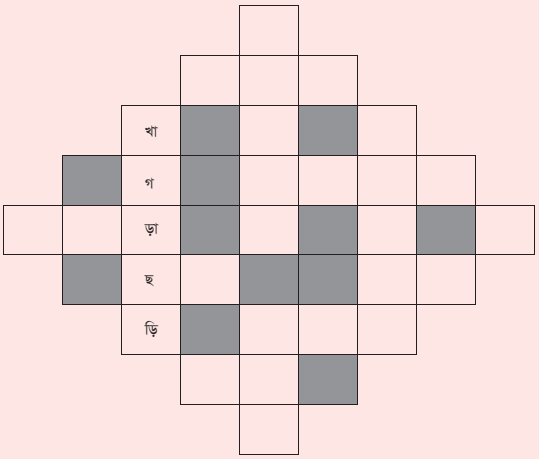

ব্রেইন ইকুয়েশন

সরল অঙ্কের মৌলিক নিয়মকে মেনে তৈরি করা হয়েছে ব্রেইন ইকুয়েশন। ছকটির খালি ঘরগুলো মেলানোর সময় অবশ্যই পাশাপাশি এবং উপর-নিচের অন্যান্য সমীকরণগুলোও মেলাতে হবে।

২	*		-	৬	=	
*	■	+	■	+	■	-
	*	২	-		=	২
-	■	-	■	-	■	-
১	*		-	৫	=	
=	■	=	■	=	■	=
	+	১	-		=	১

নাম্ব্রিক্স

পাশের ছকটির নাম নাম্ব্রিক্স। ১-৮১ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো থেকে ছকটিতে প্রতিটি সংখ্যা একবার করে বসাতে হবে। সংখ্যাগুলোকে ক্রমিকভাবে বসাতে হবে। বসানোর সময় পরের সংখ্যা পাশাপাশি বা উপরে-নিচে আকারে বসবে, কোনাকুনি বসানো যাবে না।

৩৭		৩৯	৬০		৬২			৬৫
	৪১		৫৯	৫৮	৭৫		৭৭	
		৪৫	৪৬			৮১		
	৪৩						৭৯	
৩৩					৭২			৬৯
২৪		৩০			১৩			
	২৬					৭		৯
		২৮	৫১	৫২			৫	
২১					১৬	১		৩

মুজিববর্ষের ঘোষণা

বন্ধুরা, তোমাদের জন্য সুখবর। নবারুণের 'বুদ্ধিতে ধার দাও' এতদিন খেলে উত্তর পাঠিয়েছ কিন্তু কোনো উপহার পাওনি। এপ্রিল ২০২০ সংখ্যা থেকে শুরু হয়েছে উপহারের পালা। সঠিক উত্তর দাতাদের মধ্য থেকে লটারির মাধ্যমে বিজয়ীকে দেওয়া হবে ৫০০ (পাঁচশত) টাকার প্রাইজবন্ড। এজন্য নবারুণ পত্রিকার পাতা (ফটোকপি প্রযোজ্য নয়) পূরণ করে বন্ধ খামে পাঠাতে হবে। খামের ওপর অবশ্যই লিখতে হবে 'বুদ্ধিতে ধার দাও'। পাঠাবে এই ঠিকানায়—

সম্পাদক, নবারুণ
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড
ঢাকা-১০০০

বুদ্ধিতে ধার দাও

মার্চ ২০২০ -এর সমাধান

শব্দধাঁধাঁ

মু	জি	ব	ব্যা	টা	রি		তো
জি							ফা
ব							য়ে
ভা			শে	খ	রা	সে	ল
ই			খ				আ
	দে		হা		আ		হ
	য়া		সি		ই		মে
	ল		না		ন		দ

ছক মিলাও

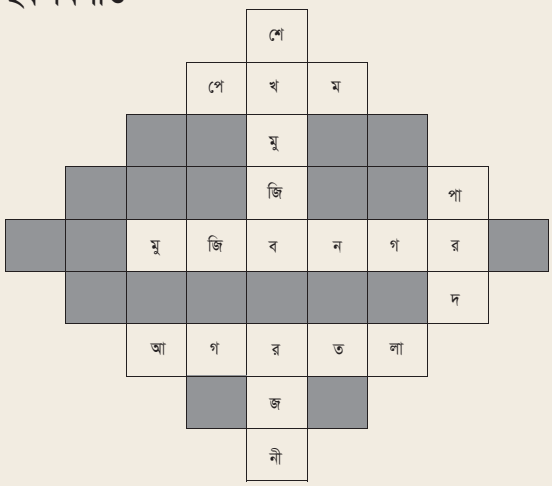

ব্রেইনইকুয়েশন

১	*	৮	-	৬	=	২
+		/		/		*
৫	+	২	-	৩	=	৪
-		+		-		+
২	+	১	-	২	=	১
=		=		=		=
৪	+	৫	-	০	=	৯

নাম্ব্রিক্স

১	২	১১	১২	৫৭	৫৬	৫৫	৫৪	৫৩
৪	৩	১০	১৩	৫৮	৬১	৬২	৬৩	৫২
৫	৮	৯	১৪	৫৯	৬০	৬৫	৬৪	৫১
৬	৭	১৬	১৫	৭৪	৭৩	৬৬	৬৭	৫০
১৯	১৮	১৭	৭৬	৭৫	৭২	৭১	৬৮	৪৯
২০	২৯	৩০	৭৭	৭৮	৮১	৭০	৬৯	৪৮
২১	২৮	৩১	৩২	৭৯	৮০	৪৫	৪৬	৪৭
২২	২৭	২৬	৩৩	৩৬	৩৭	৪৪	৪৩	৪২
২৩	২৪	২৫	৩৪	৩৫	৩৮	৩৯	৪০	৪১

সচিত্র বাংলাদেশ

দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এবং ইতিহাস-ঐতিহ্য
ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

সচিত্র বাংলাদেশ-এর
বার্ষিক চাঁদা ৩০০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১৫০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২৫.০০ টাকা

সচিত্র বাংলাদেশ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন। লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editorsb@dfp.gov.bd
dfpsb@yahoo.com

Bangladesh Quarterly

ত্রৈমাসিক ইংরেজি পত্রিকা

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120/-
Half yearly : Tk. 60/-
Per issue : Tk. 30/-

- The Bangladesh Quarterly publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with any article.
- The soft copy may be sent other than CD or Pen drive to the following e-mail address : bangladeshquarterly@yahoo.com
  bdqtrly2@gmail.com

অ্যাডহক প্রকাশনা

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

এজেন্ট ও গ্রাহকগণ নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্যভবন
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৮৩০০৬৯৯
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd

Regd, Dha, 143-Monthly Nobarun, Vol-44, No-10, April 2020, Tk-20.00

করোনাভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে করণীয়

- বিনা প্রয়োজনে বাসা থেকে বের হবেন না। ঘরের দরজা-জানালা খোলা রাখুন।
- যেখানে সেখানে কফ বা থুথু ফেলবেন না।
- হ্যান্ডশেক বা কোলাকুলি করা থেকে বিরত থাকুন।
- পরিষ্কার করে হাত না ধুয়ে চোখ, মুখ, নাক স্পর্শ করবেন না।
- কিছুক্ষণ পর পর সাবান বা হ্যান্ডওয়াশ দিয়ে কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধুয়ে ফেলুন।
- হাঁচি বা কাশির সময় রুমাল বা টিস্যু দিয়ে অথবা কনুই-এর ভাঁজে মুখ ঢেকে ফেলুন। ব্যবহার করা রুমাল ও টিস্যু ঢাকনাযুক্ত ময়লার বাক্সে ফেলে ভালোভাবে হাত পরিষ্কার করুন।
- জনবহুল স্থান এড়িয়ে চলুন ও গণপরিবহণ ব্যবহার পরিহার করার চেষ্টা করুন; অন্যথায় মাস্ক ব্যবহার করুন।
- বাসায় ফিরে পরিধানের কাপড় সাবান পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন এবং হ্যান্ডওয়াশ বা সাবান দিয়ে ভালোভাবে হাত ধুয়ে নিন। সম্ভব হলে গোসল করুন।
- বিদেশ থেকে আসা ব্যক্তিরা নিজের, পরিবারের, প্রতিবেশীর বা দেশের স্বার্থে ১৪ দিনের জন্য কোয়ারেন্টাইন বা সঙ্গনিরোধে থাকুন। অন্যথায় পরিবার বা প্রতিবেশীদের মধ্যে এ রোগ ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে।
- সরকারিভাবে ঢাকা বিমানবন্দরের কাছে আশকোনায় হজ ক্যাম্প এবং উত্তরার দিয়াবাড়িতে রাজউকের ফ্ল্যাটে কোয়ারেন্টাইন ক্যাম্প রয়েছে। কোয়ারেন্টাইন ক্যাম্পের নম্বর: আশকোনা- **০১৭৬৯০১৩৪২০, ০১৭৬৯০১৩৩৫০** এবং উত্তরা দিয়াবাড়ি- **০১৭৬৯০১৩০৯০, ০১৭৬৯০১৩০৬২**।
- হোম কোয়ারেন্টাইনের ক্ষেত্রে নিজ বাড়িতে একটি নির্দিষ্ট ঘরে প্রয়োজনীয় সকল জিনিসপত্র নিয়ে একা থাকতে হবে এবং থালা-বাসন ও অন্যান্য জিনিসপত্র পৃথক হতে হবে। এসময়ে বিশেষ প্রয়োজনে তিনফুট দূর থেকে কথা বলা যাবে। প্রয়োজনে কোয়ারেন্টাইনে থাকা ব্যক্তি মাস্ক ব্যবহার করবেন। খাবার সরবরাহকালে হ্যান্ড গ্লাভস ব্যবহার করতে হবে এবং কাজ শেষে গ্লাভস ও থালা-বাসন সাবান পানিতে কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড ভিজিয়ে রেখে পরিষ্কার করতে হবে। সম্ভব হলে আলাদা বাথরুম ব্যবহার করুন। তা না হলে বাথরুম ব্যবহারের পর ব্লিচিং-সলিউশন দিয়ে পরিষ্কার করুন ও হাত সাবান-পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।
- হঠাৎ জ্বর, কাশি বা গলাব্যথা হলে বা কোয়ারেন্টাইনে থাকা অবস্থায় অসুস্থবোধ করলে স্থানীয় সিভিল সার্জন, উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তার সাথে বা উল্লিখিত নম্বরে যোগাযোগ করুন অথবা নিচের নম্বরে যোগাযোগ করবেন: সরকারি তথ্য সেবা নম্বর- **৩৩৩**, স্বাস্থ্য বাতায়ন- **১৬২৬৩**, আইইডিসিআর- **০১৯৪৪৩৩৩২২২** (হান্টিং নম্বর)।

গুজবে কান দেবেন না। আতঙ্কিত না হয়ে স্বাস্থ্য বিভাগরে পরামর্শ মেনে চলুন

সংক্রমণ প্রতিরোধে সহযোগিতা করুন।

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য মন্ত্রণালয়
তথ্যভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা